ভালোবাসা,
প্রেম নয়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

আমি আমার বন্ধু কামালের জীবনের একটি অধ্যায় লিখছি।

কামালের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা নিউইয়র্কের গ্রে হাউণ্ড বাস টার্মিনালে। বেশ নাটকীয় সেই সাক্ষাৎকার। সেটা ছিল নভেম্বর মাস, তখনও জাঁকিয়ে শীত পড়েনি, যে-কোনো সময় তুষারপাত হতে পারে। তাই প্রচুর গরম জোব্বা জাব্বা সমেত আমাদের সঙ্গে বেশ ভারি মোটাঘাট। সেখানে আমাদের জন্য কারুর অপেক্ষা করার কথা ছিল না, কোনো চেনা মুখ দেখতে পাবো এমন আশাও করি নি।

গ্রে হাউণ্ড বাস টার্মিনাল একটি বিশাল ব্যাপার। আমাদের হাওড়া রেল স্টেশনের চেয়েও অনেক বড় তো বটেই এবং বেশ কয়েকতলা মিলিয়ে তার বিস্তার। প্রথম এলে একটু দিশেহারার মতন লাগে। আমি অবশ্য আগে এখানে বার দুয়েক এসেছি, তা অনেক বছর আগে, এর মধ্যে অনেক কিছুই বদলে গেছে। সুতরাং আমার অবস্থাও নবাগতের মতনই, তাহলেও আমি স্বাতীকে আশ্বস্ত করছিলুম যে চিন্তার কিছু নেই, ঠিকই রাস্তা খুঁজে পাবো।

আমাদের আমন্ত্রণ ছিল স্নিগ্ধা মুখার্জি ও অম্বুজ মুখার্জির বাড়িতে আতিথ্য নেবার। ওরা থাকেন নিউইয়র্ক শহর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে স্কারসডেলে। গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে আমাদের শহরতলির ট্রেন ধরতে হবে। ভিড় ঠেলেঠুলে বাইরের রাস্তার দিকে এগুচ্ছি, হঠাৎ ফিটফাট পোশাক পরা এক সুদর্শন যুবক আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম সুনীল তো? আর এ নিশ্চয়ই স্বাতী? চলো—

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিলো সবচেয়ে ভারি সুটকেসটা। স্বাতীর হাতের ব্যাগটাও সে তুলে নিলো প্রায় জোর করেই। তারপর সে এত দ্রুত হাঁটতে লাগলো তা আমাদের প্রায় ছুটতে হলো ওকে ধরবার জন্য।

বাইরে বেরিয়ে বললো, আমার সঙ্গে একটা গাড়ি আছে, তাতে অবশ্য নানান মালপত্র ঠাসা, তোমাদের একটু অসুবিধে হবে, যাই হোক, কষ্ট করে চলে যাবে, ঘন্টা দেড়েকের তো মাত্র জার্নি। ও, আমার নামটাই তো বলা হয় নি। আমার নাম কামাল। স্নিগ্ধাদি বললেন তোমরা আসছো, আমি এই পথেই যাচ্ছিলাম...।

গ্রে হাউণ্ড বাস টার্মিনালে পঞ্চাশ জাতের মানুষ, ভারতীয়ের সংখ্যাও তার মধ্যে কম নয়। কামাল আমাদের চিনলো কী করে? বিদেশের এয়ারপোর্ট বা ট্রেনবাস টার্মিনালে অপরিচিত কারুকে রিসিভ করতে এলে সাধারণত হাতে একটা ছবি নিয়ে আসতে হয়। ছবি না থাকলে একটা বোর্ডে অতিথির নাম লিখে সেটা উঁচু করে তুলে ধরে থাকে অনেকে।

কামাল বললো, আমার ওসব কিছু দরকার হয় না, আমি ঠিক বুঝতে পারি। এ পর্যন্ত কত লোককে রিসিভ করতে এসেছি, আমার একবারও ভুল হয় নি।

কামাল আমাকে জীবনে আগে কখনো দেখে নি তো বটেই, ছবিও দেখে নি, আমার নামও আগে শুনেছিল কিনা সন্দেহ। আমাকে একজন লেখক হিসেবেও সে চিনতো না। এই না-চেনার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে, কামালের বই পড়ার অভ্যেসই নেই। পরে জেনেছি, সে সদা চঞ্চল মানুষ, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতেই পারে না, বই পড়ার ধৈর্য নেই তার।

পরে আরও জেনেছিলুম যে সেই সন্ধেবেলা স্কারসডেলের দিকে যাবার কোনো প্রয়োজনও তার ছিল না। আমাদের পৌঁছে দিয়েই সে পালাই-পালাই করছিলো। এক সময় সে চলেও গেলো, সারা রাত

গাড়ি চালিয়ে বস্টনে ফিরে যাবে। যদি বস্টনে যাওয়ার অতই জরুরী তাড়া ছিল ওর, তা হলে আমাদের জন্য উল্টোদিকে অতখানি গেলো কেন কামাল? আমরা ওর অপরিচিত এবং আমাদের কাছে ওর কোনো দায়ই নেই।

এই কথা জিজ্ঞেস করলে কামাল শুধু হাসে। খানিকটা যেন কোনো শিশুর দুষ্টুমি করে ধরা পড়ার হাসি।

প্রথম আলাপেই কামাল আমাদের তুমি বলেছিলো। কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে আপনি থেকে তুমিতে নামতে আমাদের মতন শহুরে মানুষের বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। প্রায় ক্ষেত্রেই তুমিতে নামা হয় না, সম্পর্কটা আপনিতেই আটকে থাকে। কামাল ঐ সময়টাও দিতে চায় না। ঘনিষ্ঠতা হবে কি না হবে না এরকম কোনো দ্বিধাই আসে না তার মনে। আগে থেকেই সে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষকে তার নিকটাত্মীয় বলে ধরে নিয়েছে। কামাল কথা বলতে ভালোবাসে। নিউ ইয়র্ক থেকে স্কারসডেল–এ আসার পথে ওর গল্প শুনতে শুনতে আমাদের এর আগের দীর্ঘ বাস জার্নির ক্লান্তি মুছে গেল। ওকে পছন্দ না করে উপায় নেই। তখনই বুঝেছিলাম, এই মানুষটি অন্যরকম।

স্কারসডেলে পৌঁছে আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম সিগারেট রয়েছে মাত্র একটি। আসবার পথে সিগারেট কিনে নেবো ভেবেছিলুম, ভুলে গেছি। স্কারসডেল ছোট জায়গা, রাত আটটার পর সেখানে অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবার কথা। মনে মনে ভাবলুম, যাক কাল সকালে দেখা যাবে।

কিন্তু কামাল ঠিক বুঝতে পেরেছে। জিজ্ঞেস করলো, সিগারেট নেই? তা হলে তো খুবই মুস্কিল। যারা স্মোক করে, তাদের সিগারেট ছাড়া তো চলেই না, ঠিক আছে, আমি এনে দিচ্ছি।

তাকে হাজার বার বারণ করা হলো, সে শুনলো না। সে নিজে সিগারেট খায় না, কিন্তু আমার জন্য সে আনবেই। গাড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে গিয়ে আধ ঘন্টা ধরে খুঁজে খুঁজে সে নিয়ে এলো দশ প্যাকেট আমার ব্র্যাণ্ড সিগারেট। তার দামও সে কিছুতেই নেবে না।

এ যে দেখছি উপকারের নামে উপদ্রব!

স্বাতী অন্য কারুর কাছ থেকে সামান্যতম সাহায্য নিতে সঙ্কুচিত বোধ করে, সে কামালের ব্যবহারে যেন মরমে মরে যেতে লাগলো।

অল্পক্ষণ দেখেই বোঝা গিয়েছিল স্নিগ্ধাদি ও অম্বুজদার (অম্বুজ মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত অধ্যাপক। সম্প্রতি তিনি আকস্মিকভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অতিশয় গুণী ও সজ্জন ছিলেন তিনি, যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে, তা হলে তিনি নিশ্চিত সেখানে যাবেন।) বাড়িতে কামালের অবারিত দ্বার। সে যখন তখন রান্নাঘরে ঢুকে যাচ্ছে, বসবার ঘরের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে। একটা খারাপ বাল্‌ব পাল্টে নতুন বাল্‌ব লাগালো, স্নিগ্ধাদিকে রান্নার সাহায্য করার জন্য পেঁয়াজ কাটতে বসে গেল! এক মুহূর্ত সে স্থির নেই।

স্নিগ্ধাদি তাকে রাত্তিরে থেকে যেতে বললেন, কিন্তু সে থাকতে পারবে না। পরদিন সকালেই বস্টনে তার বিশেষ কাজ আছে।

স্নিগ্ধাদি তাকে খেয়ে যেতে বললেন, সে খাবে না। কারণ পেট ভরা থাকলে সারারাত গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সে কয়েকখানা বিস্কিট চিবিয়ে নেবে পথে।

স্নিগ্ধাদি সস্নেহ তিরস্কার করে বললেন, এ ছেলেটা একটা পাগল।

এরপর কয়েকদিনের ব্যবধানে কামালের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো বেশ কয়েকবার। প্রতিটি ঘটনাই চমকপ্রদ। কামালের মতন বেপরোয়া রকমের পরোপকারী মানুষ আমি সারা জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। সে সিগারেট খায় না, মদ খায় না, দীর্ঘকাল এই খোলামেলা নৈতিকতার দেশে

থেকেও সে মেয়েদের পেছনে ছোটাছুটি করে না। পরোপকারই তার একমাত্র নেশা। এই মাদকতাতেই সে সব সময় চাঙ্গা হয়ে থাকে।

কামালের জন্ম ঢাকা শহরে। যথেষ্ট ধনী পরিবারের সন্তান, প্রচুর বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও ওদের পরিবার অনেকগুলো স্টিমারের মালিক। ঢাকাতেই নবাবী হাল চালে কামাল তার জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু ও বিদেশে চলে এসেছিলো বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

তখনও পাকিস্তান দু'টুকরো হয়ে যায়নি। পশ্চিমের দাবড়ানি ও শোষণে পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফুঁসছে। অল্প বয়েস থেকেই কামালের ধারণা হয়েছিল, বাঙালী যদি শুধুই রাজনৈতিক আন্দোলন করে, অর্থনীতির দিকটা না বোঝে, তা হলে বাঙালীর বাঁচবার আশা নেই। বাঙালী ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাই সমগ্র পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্য মাত্র কয়েকটি পশ্চিম পাকিস্তানী পরিবারের করায়ত্ত।

ব্যবসা শেখার জন্যই কামাল চলে এসেছিলো পশ্চিমী দুনিয়ায়। শুধু নিজের একটা ব্যবসা দাঁড় করানোই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। সে চেয়েছিলো গরিব বাঙালি ছেলেদের দেশ থেকে আনিয়ে নেবে নেয়ামত, এদের লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করবে তারপর তাদেরও নিজস্ব ব্যবসার পথ বাৎলে দেবে। তাদের পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন হবে বাংলাদেশে, বিক্রি হবে পশ্চিম দেশগুলোতে। এর ফলে দেশের কারিগরদেরও সমৃদ্ধি হবে।

কিন্তু বিদেশে এসে একার চেষ্টায় একটা ব্যবসা দাঁড় করানো তো মুখের কথা নয়। ষাটের দশক থেকেই আফ্রিকার নানান দেশ থেকে প্রাক্তন ভারতীয় হিন্দু মুসলমানেরা দলে দলে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় পাড়ি দিতে শুরু করেছে। তাদের মূলধন ও দু'তিন পুরুষের ব্যবসার অভিজ্ঞতা দুটোই ছিল। সুতরাং তারা আখের গুছিয়ে নিয়েছে অনেক সহজে।

কামাল হার স্বীকার করতে জানে না, সে লড়ে গেল প্রাণপণে। প্রথমে কয়েক বছর কাটলো ক্যানাডায়, তারপর সারা আমেরিকা চষে বেড়ালো। মারকিনীদের ফ্যাসান ঘন ঘন বদলায়, সে তীক্ষ্ণ নজর রাখলো সেই দিকে। তারপর আস্তে আস্তে একটা করে জিনিস নিয়ে সে ঢুকতে লাগলো সুপার মার্কেট চেইনে।

কামালের নিজের অবস্থা যখন নড়বড়ে, কোনো রকমে এক মাসে কিছু লাভ হলেও পরের মাসেই লোকসান হয়ে যায়, সেই অবস্থাতেও তার পরোপকারের নেশা ঠিকই লেগে আছে। দেশ থেকে কেউ আসছে খবর পেলেই সে যাবে এয়ারপোর্টে আনতে, তার থাকার অসুবিধা হলে সে তাকে প্রথমে তুলবে নিজের আস্তানায়। কেউ চাকরি পাচ্ছে না, কামাল ঘোরাঘুরি করবে তার চাকরির জন্যে, কলেজে ভর্তি হবার জন্য কার টাকা নেই, কামালই সে জন্য দারুণ চিন্তিত, যে কোনো উপায়ে সে-ই টাকার যোগাড় করবে। এইসব কাজ তার কাছে রোজ স্নান করা, খাওয়া, ঘুমানোর মতন স্বাভাবিক। না, এই তুলনাটা ঠিক হলো না, কাজের চাপে তার প্রায়ই স্নান-খাওয়া হয় না, ঘুমেরও কোনো সময় নেই। আগেই বলেছি, আমাদের স্কারসডেলে পৌঁছে দেবার জন্য কামালকে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে বস্টনে ফিরতে হয়েছিলো, সে-রাতে সে ভালো ভালো রান্না দেখে এসেছে স্নিগ্ধাদির বাড়িতে, কিন্তু কিছুই খায় নি।

কামালের কাছে উপকৃত হয়ে কেউ কেউ যদি কুণ্ঠিত বোধ করে, তাহলে কামাল বলে, আরে, দাঁড়াও না, দেখবে শিগগিরই এত টাকা উপায় করবো যে কারুর কোনো অসুবিধা হবে না। একটা ফাণ্ড রেখে দেবো। যার যখন লাগবে সে নিয়ে খরচ করবে। আমাকে জিজ্ঞেস করতেও হবে না।

কামাল টাকা রোজগার করতে চায় অন্য অনেকের কাজে লাগবে বলে? যাদের বেশি থাকে তারাই সাধারণত অন্যকে কিছু দিতে চায় না, বরং যাদের কম আছে তারা সেইটুকু থেকেই অন্যকে যথাসাধ্য দিতে চায় কিন্তু একথা কামালকে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। হাজার হাজার অপরিচিত ও অনাগতদের সাহায্য করার দায়িত্ব যে তার কাঁধে। সকলের জন্যই সংস্থান করতে হবে তো।

আমার সঙ্গে কামালের প্রথম আলাপের সময় কামাল তার ব্যবসার মোটামুটি একটা স্থায়ী ভিত করে ফেলেছে। বস্টনে সে একটা ছোট বাড়ি কিনেছে, কানাডায় মন্টিয়েলেও একটা ঘাঁটি আছে। তার বাড়িতে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর আড্ডা। এক সন্ধ্যেবেলা দেখলুম সে একজন বিখ্যাত বাঙালী সুরকারকে খাতির যত্ন করছে, একটি দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্রীকে এক ফাঁকে পৌছে দিয়ে এলো এয়ারপোর্টে, আমাদের সঙ্গে কথা বলার মাঝে মাঝেই সে বেসমেন্টে নেমে গিয়ে তার "কারখানার" খোঁজ নিয়ে আসছে আবার আমাদের জন্য রান্নার তদারকি করতেও তার আলস্য নেই।

এক সময় আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, কামাল, তোমার পুরো নাম কি? সবাই তোমাকে কামাল বলে ডাকছে শুনছি, কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই আরও নাম আছে।

ওর মুখের হাসিটা বদলে গিয়েছিল হঠাৎ। দেয়ালের দিকে চোখ রেখে বললো, নাঃ, আর কিছু নেই। দরকার কি? আগে আমার একটা পুরো নাম ছিল বটে, এখন আর সেটা আমি গ্রাহ্য করি না, আমার মা-বাবা নেই, মানে তাঁরা আছেন, কিন্তু আমি মনে করতে চাই না। আমার ভাইবোন আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, আমি একলা। কামাল নামটা আমি আরও ছোট করে ফেলতে চাই, যাতে আমার আগেকার পরিচয় বুঝবার কোনো উপায় আর না থাকে। আমার নাম হবে শুধু কে। লোকে জিজ্ঞেস করবে, কে? আমি বলবো, আমি কেউ না।

তখনই প্রথম বুঝেছিলাম, এই হাসিখুশি মানুষটার মধ্যে একটা কোনো গভীর বিষাদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

তারপর আস্তে আস্তে সে আমাকে তার জীবন কাহিনী শুনিয়েছিল।

১

জুলেখা যখন প্রথম আসে, তখন কী অবস্থা শুনবে? শুনলে তোমরা হাসবে! আমি তখন ঘুরতে ঘুরতে গেছি আরিজোনায়। সেখানকার টুসন শহরে একটা মেলা হবে। সেই মেলায় আমি আমার প্রোডাক্ট বেচবো। প্রোডাক্ট মানে সুন্দর কাজ করা পাটের থলে, সেগুলো তখন হ্যাণ্ডব্যাগ হিসেবে ভালো চলছে।

সেখানে আমার হঠাৎ কী খেয়াল হলো, এক সন্ধেবেলা একজন সাউথ আমেরিকানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গেলাম। তা সেটা একটা দৈত্য, তার সঙ্গে কি আমি পারি? কিন্তু আমি তো কোন ব্যাপারেই আগে থিকা হার স্বীকার করি না, তাই নিলাম ওর চ্যালেঞ্জ। সে আমার ডাইন হাত ধরে এমন একখানা ঝাঁকুনি দিলো যে আমার কল্যার-বোন ভেঙ্গে গেল। তখন ঠিক বুঝি নাই, তখন বেশি ব্যথাও হয় নি বুঝলে, কিন্তু দুই দিন পর হাতখানায় প্যারালিসিসের মতন হয়ে গেল। তারপর ডাক্তার, হাসপাতাল কত কী কাণ্ড!

আমার কাঁধ ও হাতজোড়ায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ। শুয়ে থাকতে তো পারি না, তুমি জানো আমার স্বভাব, হেঁটে চলে বেড়াই, কিন্তু কাজকর্ম বিশেষ হয় না। এই সময় নিউইয়র্ক থেকে একদিন শামীম টেলিফোন করলো। আমার আব্বা-আম্মা আসছেন। সঙ্গে করে আনবেন জুলেখাকে।

আমি তখন কী করে ফিরে যাই? আরিজোনায় আমার প্রোডাক্টগুলো না বেচে যদি ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাতে অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে। ওখানে কিছুদিন থেকে যাওয়া খুবই দরকার। তাছাড়া আব্বা-আম্মা এসেই আমার এই ভাঙা হাত দেখবেন, সেজন্য আমার লজ্জা করছিল। তাই শামীমকে বললাম, আমি এখন যেতে পারছি না, আব্বা-আম্মা তো সোজা ক্যানাডায় যাবেন, তুমি জুলেখাকে নিউইয়র্ক থেকে টুসন-এর প্লেনে তুলে দিও। আমি এয়ারপোর্টে রিসিভ করে নেবো।

তারপর কয়েকটা দিন, সত্যি কথা বলছি তোমায়, আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। সর্বক্ষণ, জুলেখার কথা ভাবি। সর্বক্ষণ, একটা মিনিট'ও বাদ নেই। ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া, তা ঘুমের মধ্যেও রাতে দু'তিনবার ঘুম ভেঙে যায়, আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে জুলেখার মুখ। সে মুখও অস্পষ্ট। জুলেখাকে তো আমি আগে ভালো করে দেখি নাই।

তোমাদের বিয়ের সময় শুভদৃষ্টি হয় না?

হা হা হা, কেন হবে না। সব বিয়েতেই শুভদৃষ্টি হয়, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সব বর-কনেই ঐ দিন শুভদৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু আমি যে আমার বিয়ের আসরেই ছিলাম না।

তার মানে?

আমার বিয়ের গল্পই বুঝি তোমাদের বলি নাই? তাহালে তো আরও আগে থিকাই বলতে হয়। আমার জীবনের তো সবই অদ্ভুত, আমার বিয়েটাও হয়েছিল অদ্ভুতভাবে।

আমি তো বেশ কয়েক বছর আগেই দেশ থেকে চলে এসেছি। বাউণ্ডুলের মতন ঘুইরা বেড়াই, কোথায় খাই, কোথায় শুই তার ঠিক নাই। এখানে তো ঢাকার অনেক লোক আছে জানোই, তারা দেশে গিয়ে আমার সম্পর্কে গল্প ছড়ায়, আমার বাবা মা'র কানে সেইসব গল্পই যায়। ওনারা আমাকে ফিরে যেতে বলেন, কিন্তু আমি তো যাবো না? তখন বিজনেস দাঁড় করাতে পারি নাই। হার স্বীকার করে ফিরে যাবো? যদি জখম হই, যদি প্রাণে মরার আশঙ্কাও থাকে, তাহলেও কি পুরুষমানুষ শেষ পর্যন্ত না-দেখে হার স্বীকার করে?

আমার বাবা-মা তখন জিদ ধরলেন আমাকে বিয়ে করতে হবে। বিদেশে ছেলে একলা থাকে, এখানে কত হুরী-পরী ঘুইরা বেড়ায়, তারা যদি কেউ এ ছেলের মাথা চিবায়ে খায়, কিংবা আমারে ভ্যাড়া বানাইয়া দ্যায়, এই ভয় বুঝলে! তা ওনারা সম্বন্ধ আনেন আর আমি ক্যানসেল কইরা দিই, আমার তখন কত বয়েস?

তখন? আমার বয়েস তখন...দাঁড়াও, হিসাব কইরা নিই, হ্যাঁ বছর তিরিশেক হবে। আমাদের ওদিকে সকলের একটু আগে আগেই বিয়ে-শাদী হয়ে যায়, আমার বয়েসী অনেকেই দু'তিন ছেলেমেয়ের বাবা! শেষ পর্যন্ত একবার আর অমত করতে পারছিলাম না। মা জানালেন যে তিনি এই মেয়েটির ব্যাপারে কথা দিয়ে ফেলেছেন। আমার বাবার শরীর ভালো না, আমি পরিবারের বড় সন্তান, আমার বিয়ে তিনি দেখে যেতে চান।

সব বাবা-মায়েরাই এইরকম কথা বলে, তাই না?

তা ঠিক। তবে, সে সময় আমার মনটাও নিশ্চয় কিছুটা নরম হয়ে গিয়েছিল। একলা ঘুরে ঘুরে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম, এ দেশের মেয়েদের সাথে তেমনভাবে কখনো মিশি নাই, মানে মিশেছি, অনেক মেয়ের সাথেই আমার বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু শুধুই বন্ধুত্ব, তার বেশি আর এগোই নাই। তোমাকে কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি, তুমি অবিশ্বাস করছো না তো?

না, না, এর মধ্যে অবিশ্বাসের কি আছে? বন্ধুত্ব হলেই যে প্রেম হবে তার তো কোনো মানে নেই।

মেয়েদের সাথে নিছক জৈবিক সম্পর্ক পাতাবার ব্যাপারেও আমার মানের মধ্যে বরাবরই একটা বিতৃষ্ণার ভাব আছে। যাই হোক, তখন আমার ঘর বাঁধার একটা ঝোঁক হয়েছিল নিশ্চয়। মেয়েটির কথা শুনেও আমি খানিকটা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ওদের বেশ শিক্ষিত বংশ, জুলেখার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাংলাদেশের একজন নামকরা কবি, নাম শুনলে তুমি নিশ্চয়ই চিনতে পারবে, কিন্তু থাক। জুলেখার বাবাকে খানসেনারা গুলি করে মেরেছিল খুলনায় রাস্তায়, জুলেখা নিজের চোখে তা দেখেছে। ভাবো তো, একটা মেয়ের কাছে এটা কতখানি আঘাত! ঐ ঘটনা শুনেই আমার মনে হয়েছিল আহা রে, যে মেয়ে অতখানি কষ্ট পেয়েছে, তাকে আমার যেমন করে হোক সুখী করা উচিত। আমি ঐ বিয়েতে রাজি হয়ে গেলাম।

বিয়ের আসরে তুমি যেতে পারলে না কেন? বর ছাড়া বিয়ে হয়?

তখন যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। পঁচিশে মার্চের সেই ক্র্যাক ডাউন, মনে নেই তোমার? বিয়ের কথাবার্তা, তারিখ সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ রকম অবস্থায় আমার পক্ষে ঢাকায় যাওয়া সেইফ না। বিয়ের অনুষ্ঠান ঠিকই হলো সব, আমি আমার আব্বার নামে ওকালতনামা দিয়েছিলাম, উনি দেন-মোহরের কাগজে সই করলেন। এখানে বসে আমার ফরজ, গায়ে-হলুদ, নামাজ পড়া ইত্যাদি করতে হলো, তারপর আমি সেই টেলিফোন করলাম এখান থেকে।

ঠিক সময়ে টেলিফোনের লাইন পেলে?

এ দেশ থেকে পাওয়া যায়। অপারেটরকে আগের থিকা বলে রাখছিলাম, অপারেটরের নাম জুলি, বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার সঙ্গে...

তার মানে এ দেশে আসবার আগে জুলেখাকে তুমি দ্যাখোনি?

না, তা ঠিক নয়। দেখেছি। বিয়ের পর একবার গেছিলাম ঢাকায়। কিন্তু আমাদের তো মস্ত বড় সংসার। বাড়ির সবখানেই মানুষ। সেবার বেশি দিন থাকতেই পারি নাই ঢাকাতে। কলকাতায় যেতে হলো একটা স্যাম্পেল মালের খোঁজ করার জন্য, তার পর মন্ট্রিয়েলে ফিরে আসতে হলো।

জুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন?

কিছু অসুবিধা ছিল। এ দিকে একটুখানি গুছিয়ে নেওয়া দরকার। একটা ভালো অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজ করছিলাম, আর বিজনেসেরও দু'একটা ব্যাপারে।

নতুন বউ তোমার সঙ্গে আসতে চায় নি?

তা চেয়েছিল। আসার আগের দিন খুব লাজুকভাবে বলেছিল, আপনে আমারে কবে নিয়ে যাবেন? আমি বলেছিলাম, যত শীঘ্র পারি, তুমি দু'একটা মাস শুধু সবুর করো।

কতদিন পরে এসেছিল?

প্রায় এক বছর। জুলেখা টুসনে আসার কিছুদিন পর আমরা টেক্সাসে গিয়ে আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকী পালন করলাম। সেটা আমাদের প্রথম হানিমুনও বলতে পারো।

বিয়ের পর এতদিন জুলেখা কোথায় ছিল? তার মায়ের কাছে না তোমাদের বাড়িতে?

আমাদের বাড়িতে।, ঢাকায়। মায়ের কাছেও দু'একবার গেছে, বেশিরভাগ সময়টাই আমাদের বাড়িতে। যাই হোক, টুসনে জুলেখা আসার আগের কথাটা শোনো। শামীম ফোন করার পরেই তো আমার একেবারে অবশ হবার মতন অবস্থা। খালি স্বপ্নই দেখি, স্বপ্নই দেখি, হা–হা, হা, কী বলবো তোমাকে, সে যে কতসব উদাস স্বপ্ন।

নতুন বউ আসছে, প্রথম সংসার পাতবে, তা নিয়ে স্বপ্ন দেখবে না? কী কী স্বপ্ন দেখেছিলে মনে আছে?

তুমি ঠাট্টা করছো? না, শোন, একটা অন্য কথা বলি। আমার তো হাতে আর ঘাড়ে তখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সেই অবস্থায় এয়ারপোর্ট যাবো, নতুন বউ প্রথমেই তো আমাকে দেখে আতকে উঠবে!

আতকে নয়, আঁতকে। বাঙালরা চন্দ্রবিন্দু বড় কম ব্যঁবহার করে!

হা, হা, হা! ঠিক বলেছো। কেন এরকম হয় বলো তো?

বাঙালরা বোধ হয় সূর্য বংশের লোক। হ্যাঁ, তারপর কী হলো?

আমি ভাবলুম, নতুন বউ আমাকে এই অবস্থায় দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। তাকে তো বলতে হবে যে এরকম কী করে হলো? কী বলি? যদি বলি পাঞ্জা লড়তে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে, তাহলে সেটা একটা হাসির ব্যাপার হবে। আমাকে হয়তো বোকাই ভেবে বসবে! প্রথমে ভাবলাম মাগিং–এর কথা বলবো। রাস্তায় তিনটে গুণ্ডা আমাকে ধরে টাকা পয়সা চেয়েছিল, আমি দিতে রাজি হই নাই, একজনের নাকে ঘুষি মারলাম, তারপর পিছন থিকা একজনে ছুরি মারলো!

বাঃ ভালো গল্প? বউয়ের কাছে সবাই হিরো সাজতে চায়।

হা– হা–হা, আমারও ঠিক সেই কথাটাই মনে হয়েছিল আর হাসি পেয়েছিল। তাছাড়া ও গল্পটা চলে না। আমার ঘাড়ে কোনো উণ্ড নাই, একদিন ঠিক জুলেখা বুঝে ফেলবে। তারপর ভাবলাম বলবো যে একটা সাংঘাতিক কার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। আমি তো রাত-বিরেতে ঘুরে বেড়াই, এরকম অ্যাকসিডেন্ট যখন তখন হতে পারে....

তুমি বড্ড জোরে গাড়ি চালাও?

আমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে কিন্তু এ্যাকসিডেন্ট হয় না। তাপর শোনো, আমি ঠিক করে ফেললাম, ওসব কিছুই বলবো না। আমি সত্যি কথা বলবো। আমার চরিত্র ঠিক যে–রকম সেটাই আমার স্ত্রী বুঝুক। প্রথম দিন থেকেই একটা মিথ্যার ওপর আমাদের সম্পর্কটা গাড় করাতে চাই না। মিথ্যা কথা বলা আমার ধাতেও নাই। আমি মনস্থির করে ফেললাম, জুলেখার কাছে আমি কোনদিন কিছু লুকোবো না। জুলেখার সাথে আমার বোঝাপড়া থাকবে যে আমরা সব সময় পরস্পরের সত্য ভাগাভাগি করে নেবো। আর, এই কথাটা চিন্তা করে কী অদ্ভুত একটা আরাম হলো। স্পষ্ট মনে আছে সেই সন্ধ্যেটার কথা। টুসনে বেশি ঠাণ্ডা পড়ে না জানোই তো। পরিষ্কার আকাশ, কাছেই তো মরুভূমি তাই আকাশ খুব উজ্জ্বল, ঝকঝক করছে তারা, সেই দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলেছিলাম, হে আল্লা তোমার দয়ায় এবার থেকে আমার জীবনটা অন্যরকম হবে। মানুষের পক্ষে এক একা তার জীবনটা বহন করা বড় কষ্টকর। আমি তো শুধু স্ত্রী চাই নি, আমি আমার জীবনসঙ্গিনী চেয়েছিলাম। জুলেখা সত্যি আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার দুঃখ-কষ্ট, সব সে ভাগ করে নিলো। ব্যবসা দাঁড় করাবার জন্য আমাকে তখন প্রচুর খাটাখাটনি করতে হচ্ছে, ও নিজেও হাসিমুখে সব শেয়ার করতে লাগলো।

উঁহু, তুমি অনেকখানি বাদ দিয়ে গেলে। প্রথম দিন দেখা হবার ঘটনা.....

হ্যাঁ, সে তো জুলেখা এলো ঠিক দিনেই। এয়ারপোর্টে আমি ওকে রিসিভ করলাম। তারপর দুজনে মিলে শুরু করে দিলাম। ব্যবসার কাজ।

প্রথম দিন থেকেই? নতুন বউ একটা নতুন দেশে এলো, তাকে ধাতস্থ হয়ে নেবার সময় দিলে না?

প্রথম দু'একটা দিন অমনিই গেল অবশ্য। একটু লজ্জা লজ্জা ভাব, একটু আড়ষ্টতা তো আছেই। কিন্তু মনে মনে আমি তো তাকে খুব আপন করে নিয়েছি। তার তো আর কোনো দূরত্ব অনুভব করার কথা নয়। তবে জুলেখা স্মার্ট মেয়ে, বিদেশে এসেই ঘাবড়ে যাবার মতন নয়। বিয়ের পর পরই আমি যখন ঢাকায় যাই, তখন প্রথম রাত্তিরেই সে বলেছিল যে, সে ঢাকায় থাকবে না, এখানে আসবে।

ও, তাহলে তোমাদের আগেই বাসর শয্যা হয়েছিল ঢাকাতে?

হ্যাঁ, তা এরকম হয়েছিল বলতে পারো, বিয়ের সময় তো আমি উপস্থিত থাকি নি, তাই পরে যখন আমি ঢাকায় গেলাম, আবার নতুন করে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হলো ফুলশয্যাও হলো। আমার বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছিল আমি ঢাকাতেই থেকে যাই। কিন্তু প্রথম রাতেই জুলেখা আমাকে দুটো কথা বলেছিল। প্রথমে বললো, আপনে কি এখনই সন্তান চান? আমি উত্তর দিলাম, সেটা তোমার ব্যাপার। সন্তান তো আমি গর্ভে ধরবো না, তুমি ধরবে, সুতরাং তুমি যখন চাইবে। আর দ্বিতীয়ত বললো, আমি ঢাকায় থাকতে চাই না কোনো কারণে ঢাকায় থাকতে ওর অসুবিধা হচ্ছিল.....

জুলেখা লেখাপড়া করেছিল ?

হ্যাঁ, বি. এ. পাশ করেছিল আগেই। স্টুডেন্ট ভালো ছিল। এখানে এসে আবার পড়াশোনা করতে চেয়েছিল।

এখানে এসে ভর্তি হলো ইউনিভার্সিটিতে?

না, প্রথমেই সে কথা ওঠে নাই। নতুন সংসার পাততে হবে, ব্যবসাটাকে দাঁড় করাচ্ছি, জুলেখা হয়ে উঠলো আমার যোগ্য পার্টনার। আমার অনেক কিছু বলতেই হয় না, নিজে নিজেই সে বুঝে নেয়।

টেক্সাস থেকে তোমরা সোজা চলে এলে বস্টনে?

ঠিক সোজা নয় ঘুরতে ঘুরতে। তারপর বস্টনে এসে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিলাম। কাছাকাছি আমাদের বাংলাদেশের অনেক লোকজন থাকে, তাদের সাথে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলাম, যাতে জুলেখার একা একা না লাগে। কাছেই থাকতেন ডঃ আজাহারউদ্দীন, আমার কিছুটা আত্মীয় হন, অতি ভালোমানুষ, তিনি আর তাঁর স্ত্রী মীনা ভাবী আমাদের খুব ভালোবাসতেন। আমি কাজে-কর্মে হঠাৎ আউট অফ টাউন গেলে মীনা ভাবী জুলেখার খোঁজখবর নিতেন।

তোমার স্ত্রী প্রথমেই সন্তান চান নি?

না তখনই চায় নি। জুলেখা গান ভালোবাসে, সিনেমা থিয়েটার ভালোবাসে। নদীর ধারে বেড়াতে ভালোবাসে, সেই সব বাদ দিয়ে সে তখুনি মা হয়ে জড়িয়ে পড়তে চায় নাই। আমিও আপত্তি করি নাই, আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে নাই। কিন্তু সেই সময় থেকে আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে লাগলো তুমি সেটা শুনবে?

কেন শুনবো না?

বোঝাতে পারবো কিনা জানি না। মেয়েদের যেমন গর্ভ হয় আমারও সেরকম একটা কিছু হতে লাগলো। না, না, পেটের মধ্যে নয়, তুমি ওভাবে তাকাচ্ছো কেন? হা-হা-হা! আ, আমার প্যাটে কিছু হয় নি, জিনিসটা জন্মালো আমার বুকের মধ্যে। ঠিক গর্ভের মতনই, প্রথমে ছোট হয়ে একটু একটু করে বাড়তে লাগলো। প্রথমে বুঝতেই পারিনি সেটা কি, পরে বুঝলাম। সেটারই নাম ভালবাসা। জীবনে আগে কখনো এমন অনুভব করি নাই, আমার বুকের মধ্যে বিশাল এক ভালবাসা জন্ম নিয়েছে। সেই ভালবাসা জুলেখার জন্য বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ সেই ভালোবাসা রয়েছে বলে আমার কী আনন্দ! কী নতুন জীবনীশক্তি! অবশ্য জুলেখাকে সেই ভালোবাসার কথা ঠিক বুঝাতে পারি নি। আমার তো তোমাদের মতন অত ভাষাজ্ঞান নাই।

ভাষা ছাড়াও ভালোবাসা বোঝানো যায়।

হয়তো জুলেখা কিছুটা বুঝেছিল। তবে সে যতটা বুঝেছিল আমার ভালোবাসা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি।

তোমার বাড়িতে তখনও অনেক ছেলেমেয়ে আসতো?

আসবে না কেন? আমি বাড়ির দরজা বন্ধ রাখায় বিশ্বাস করি না। যার যখন প্রয়োজন হবে কিংবা ইচ্ছে হবে তখন আসবে। আসলে বুঝলে, প্রয়োজন ছাড়াও কেউ কেউ আসতে চায়। যারা নতুন আসে, তারা প্রথম প্রথম খুব মন-মরা হয়ে থাকে, এত হোম সিক হয় যে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তখন দেশের কোনো লোকের সঙ্গে বাংলায় কিছুক্ষণ কথা বললে শান্তি হয়। কেউ কেউ নিজের কেরিয়ারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। পরামর্শ চায়, তাই ছুটে আসে আমার কাছে।

তবে যখন তখন অনবরত বাইরের লোক এলে নতুন বউয়ের অসুবিধে হতে পারে—

জুলেখা আমার পাগলামিগুলো মেনে নিয়েছিল। সে নিজেও মজা পেত। আমি তো পাগল তা সবাই জানে। আমি যে রকম আমি সেই রকমই। পৃথিবীতে মানুষ যদি মানুষকে ভালো না বাসে, যদি সাধ্য মতন সবাই সবাইকে একটু সাহায্য না করে, তা হলে বেঁচে থাকার সার্থকতা কী, বলো? আমার বাড়িতে যে ছেলেমেয়েরা আসতো, তারা সবাই খুব পছন্দ করতো জুলেখাকে। জুলেখার ফর্সা রং, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, পোশাক পরতে জানে মানানসই করে, সে সকলের ভাবী হয়ে গেল। জুলেখা তাদের খাওয়াতে-দাওয়াতে কোনো কার্পণ্য করে না।

একদিন সে খুব রেগে গিয়েছিল। এক উইক এণ্ডে আমি কাজে গেছিলাম ওয়াশিংটন ডি, সি-তে। রবিবারেই ফেরার কথা ছিল, কিন্তু কাজ মিটিয়ে ফিরতে ফিরতে সোমবার রাত এগারোটা হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতেই জুলেখা বললো যে, এম. আই. টি. থেকে জলিল সাহেব তিনবার ফোন করেছিলেন, খুব নাকি বিশেষ দরকার : তখন এগারোটা বাজে, ভাবলুম রাত্রে আর টেলিফোন করবো না, সকালেই করবো। খিদে ছিল না তবু জুলেখা জোর করে খেতে বসালো।

আমাদের বাড়ি তো সাধারণত নিরিবিলি থাকে না, সেদিন আর কেউ ছিল না, শুধু আমরা দু'জন। একটু একটু করে খাবার খাচ্ছিল আর আদর করছিল, আদরটাই বেশি, অপূর্ব একটা সুন্দর সময় কাটছিল, এই সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। এত রাতে কে ফোন করে। জুলেখাই ধরলো। তারপর রিসিভারের মুখ চাপা দিয়ে, ঠোঁট-মোট বেঁকিয়ে মজার একটা ভঙ্গি করে বললো, আবার সেই পাজীটা।

আমি গিয়ে ফোন ধরলাম। গলার আওয়াজ শুনেই অবাক হলাম।

জলিল সাহেবই আবার ফোন করেছেন। জলিল সাহেব বিরাট বিদ্বান, এদেশে অধ্যাপক হিসেবে নাম-ডাক আছে, আমরা সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। সেই জলিল সাহেবকে জুলেখা বললো 'পাজীটা'?

জলিল সাহেব বললেন, শোন কামাল, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা দরকার আছে, তাই আগে কয়েকবার তোমার খোঁজ করেছিলাম, তুমি কখন ফিরলে?

আমি বললাম, এই খানিক আগে। আপনি কোন মেসেজ রাখেন নাই, আপনে যদি জুলেখাকে কিছু বইলা দিতেন তাইলে আমি ফেরামাত্র আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতাম।

উনি বললেন, না না, এখন আমার বাড়িতে আসার দরকার নেই। তবে তুমি আজই রাত করে বাড়ি ফিরলে, এখন তোমাকে বলতে একটু দ্বিধা হচ্ছে।

না, না, বলেন না, কী ব্যাপার।

আমাদের হোম সেক্রেটারি ওমর সাহেবকে তুমি চেনো?

না, চিনি না, তবে নাম শুনেছি। তিনি এসেছেন নাকি এখানে? কোথাও নিয়ে যেতে হবে তাঁকে?

না, তিনি আসেন নি। তাঁর ছোট ছেলে আসছে। আজ সকালেই একটা টেলেক্স পেলাম। দ্যাখো দেখি, একটু আগে থেকে খবর দেন নাই, তার থাকার জায়গার একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। ছেলেটি এই প্রথমবার আসছে, এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ না করলে সে নিজে দিশা পাবে না, এদিকে আমার এখন অসুবিধা।

আমি তারে রিসিভ করবো, আপনে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? কখন আসবে সে, কোন্ ফ্লাইট, কয়টার সময়?

ছেলেটি দুই দিন বোধ হয় থাকবে বস্টনে। তোমার ওখানে কি তারে রাখতে পারবা?

হ্যাঁ। আমার দু'টা ঘর আছে, অসুবিধা তো কিছুই নেই। এখানেই থাকবে, না না, আপনি ওসব বলছেন কেন, এইটুকু সামান্য কাজ, আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন জলিল ভাই....

আমি একটা কাগজে ছেলেটির নাম, ফ্লাইট নাম্বার ইত্যাদি লিখে নিচ্ছিলাম জুলেখা এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। তলার ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছে মাথাটা। লিখবো কী, জুলেখার দিক থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি না।

জালিল সাহেবকে আমি বললাম, আপনি একদম চিন্তা করবেন না, ছেলেটির পুরা দায়িত্ব আমার রইলো, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে যান। খোদা হাফিজ।

টেলিফোন রাখার পর জুলেখা আমার নাকের ডগাটা এক আঙুলে টিপে দিয়ে বললো, বোকা একটা!

আমি জুলেখাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, সে একটু সরে গিয়ে বললো, ঐ পাজীটা তোমাকে বোকা বানালো, অমনি তুমি তা মেনে নিলে?

জুলেখা, তুমি জলিল সাহেবকে পাজী বলছো? উনি কত বড় পণ্ডিত জানো? আমাদের দেশের একটা গর্ব।

হোক পণ্ডিত! ঐ যে ছেলেটা ঢাকা থেকে আসছে, সে কি তোমার ভরসায় আসছে? তোমার সাথে চেনা নাই শুনা নাই।

আহা তাতে কী। দেখা হলেই চেনা হয়ে যাবে। এইভাবেই তো মানুষের সাথে চেনা হয়।

ওর দায়িত্ব জলিল সাহেব পুরোপুরি তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। কেন, উনি নিজে ছেলেটিকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যেতে পারতেন না? ওর নিজের বাড়িতে জায়গা নাই? কত বড় বাড়ি–

জলিল সাহেব ব্যস্ত মানুষ...

তুমি বুঝি ব্যস্ত নও? ওয়াশিংটন থেকে আট ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে ফিরলে কী শখ করে?

আহা, তুমি বুঝছো না, আমার সাথে কি জলিল সাহেবের তুলনা চলে?

ওনার বউও তো গাড়ি চালায়। সুপার মার্কেটে একা একা যায়। ওদের বাড়িতে তিন চারখানা ঘর, ছেলেটিকে রাখতে পারতো না বুঝি? তুমি সারাদিন ক্লান্ত হয়ে আবার ভোর পাঁচটায় এয়ারপোর্টে দৌড়াবে?

আমার তাতে কোন অসুবিধা হয় না।

তোমাকে যেতে হবে না। তুমি যেতে পারবে না।

তা কী করে হয়? ছেলেটি প্রথম আসছে, নিজে বাড়ি খুঁজে পৌছোতে পারবে না।

জলিল সাহেবের ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে।

কিন্তু তুমি ছেলেটির কথা ভাবো। তার তো কোনো দোষ নেই। সে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়বে।

শোনো, তুমি গাধার মতন খেটে মরো বলে সবাই তোমার ওপর সুবিধা নেয়। যে–যার নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে তোমার ঘাড়ে চাপায়। সবাই মনে মনে ভাবে, কামাল বোকাটা তো আছেই। আমার স্বামীকে কেউ বোকা ভাবলে, এটা আমার সহ্য হয় না।

হা-হা-হা। আমি কি সত্যি বোকা?

তুমি নিতান্ত ভালোমানুষ সেটাকেই এ–যুগে সবাই বোকামি মনে করে।

দ্যাখো, অতি–চালাক হওয়ার থেকে বোকা থাকাই ভাল। তাতে মনে শান্তি থাকে। আমি যা করি, তাতে মনে শান্তি পাই। কই খাবারটা শেষ করে নাও।

জুলেখা খাবারে হাত দিলো না, কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো একদিকে। তার ফর্সা, মসৃণ কপালটা দেখে মনে হচ্ছিল চাঁদের মতন। আমি তো কবি–টবি নই, তবু আমারও এই রকম মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝলে। আমি জুলেখাকে সেই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই সে বললো, তুমি যে শেষ রাত্তিরে একজন লোককে এই বাড়িতে নিয়ে আসবে, এখানে কয়েকদিন রাখবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একবারও তো আমাকে জিজ্ঞেস করলে না। আমার মতামত নিলে না। আমার সুবিধা অসুবিধার কথা জানালে না? তা হলে কি এই বাড়ি শুধু তোমার একার? তুমি যা ঠিক করবে আমাকে তাই–ই মেনে নিতে হবে?

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে জুলেখার হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, না, না, না, এটা আমার ভুল হয়েছে। আমি সত্যি বোকামি করেছি। এই সংসার তোমার, তুমি যা বলবে তাই-ই হবে। এতদিন আমি শুধু একটা ঘরে থাকতাম, আমার কোনো সংসার ছিল না। তুমি এসেছো, এবারে সত্যি করে সংসার হয়েছে। তোমার মতামত না নিয়ে আমি একা কোনো সিদ্ধান্ত নিব না। তুমি দেখো!

২

স্বামী অর্থ–উপার্জন করবে আর স্ত্রী রান্নাঘর ও শয়নঘরের সব ভূমিকা যথাযথ পালন করবে, এটাই তো এখনো পর্যন্ত বাঙালী পরিবারের প্রথা। স্বামীর জন্য বাইরের জগৎ, স্ত্রীর জন্য অন্দরমহল। রান্নাঘরের পর্দা সরিয়ে স্ত্রী বসবার ঘরে মাঝে মাঝে ঢুকতে পারে অবশ্য, তবে তা প্রায় সময়েই অতিথিদের চা–জলখাবার দেবার জন্য। স্ত্রীকে মাঝে মাঝে গল্প করার জন্য ডাকা হবে বটে; কিন্তু অ্যাশট্রেটা যদি সিগারেটের টুকরোতে ভর্তি হয়ে যায় তবে স্ত্রীকেই উঠতে হবে সেটা পরিষ্কার করার জন্য, আড্ডার মাঝখানে নতুন কেউ এলে স্ত্রী আবার চায়ের জল বাসতে যাবে।

মাঝে মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাওয়া হবে বটে তাও কিছু নির্বাচিত দৃশ্য দেখবার মতন। স্ত্রীর হাতে কিছু থোক টাকা দেওয়া হবে শাড়িটাড়ি কেনার জন্য। হোটেলের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে স্বামী যখন ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলে তখন পেছনে দাঁড়ানো স্ত্রীকে মনে হয় একটি ঝলমলে কাপড়ের পুঁটলি। ডেস্কক্লার্ক যদি কোনো যুবতী হয় স্বামী তার সঙ্গে হাসি-মস্করা করতে পারে, কিন্তু কোনো অচেনা পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী হেসে হেসে কথা বলছে, এ দৃশ্য অবিশ্বাস্য।

কামালের কী করে যেন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, নারী ও পুরুষের সব ব্যাপারেই সমান অধিকার থাকা উচিত। দু'জনে একসঙ্গে স্বামী–স্ত্রী হিসেবে থাকতে গেলে সব কাজ সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। দু'জনের মতামতের মূল্যও সমান।

এ রকম একটা ধারণা থাকা আর সত্যি সত্যি প্রতিদিনের জীবনে এই আদর্শ কাজে পরিণত করা এক কথা নয়।

কামাল বেশি বেশি কাজ করে। কাজের নেশা আছে বলেই সে অক্লান্ত। জুলেখা রান্না করতে গেলে কামাল তার পেঁয়াজ কুঁচিয়ে দেয়। খাওয়ার টেবিলটা সেই–ই মুছে রাখে। খাওয়ার পর জুলেখার আপত্তি সত্ত্বেও সে এঁটো প্লেট–বাসন ধুয়ে ফেলে চটপট। বেসমেন্ট থেকে সে ওয়াশিং মেশিনে জামা–কাপড় কেচে আনে। কোনোদিন বাড়ি ফিরে যদি সে দেখে জুলেখা একখানা বই পড়ছে, অমনি সে বলে ওঠে, না না, আজ আর রান্নার ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই, আমি কয়েকখানা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে ফেলছি, দ্যাখো না, কত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

জুলেখাকে সে গাড়ি চালানো শেখায়। জুলেখাকে সে তার ব্যবসায় কাজকর্ম বুঝিয়ে অর্ধেক ভার নিতে বলে। জুলেখা বুদ্ধিমতী, কোনো কিছুই শিখতে তার দেরি হয় না।

একদিন জুলেখা বললো, চলো, আজ একটা সিনেমা দেখতে যাবে?

সিনেমা, কোথায়?

ড্রাইভ ইন টু–তে একটা ভালো ছবি দেখাচ্ছে।

কেন, টি. ভি–তে আজ সিনেমা নেই?

ওখানে পল নিউম্যানের একটা ছবি দেখাচ্ছে, খুব নাম–করা।

আজ শুক্রবার না? শুক্রবার রাত্তিরে টি. ভি.–তেও তো ভালো সিনেমা দেখায়। কাগজটা দ্যাখো না। জুট ব্যাগের যে অর্ডারটা আজ পেলাম তার হিসাবটা আজই রাতের মধ্যে করে ফেলতে হবে। তুমি টি. ভি. দ্যাখো, আমি হিসাবটা করে ফেলি।

কামাল নিজেই খবরের কাগজ খুলে বিভিন্ন চ্যানেলের টি. ভি. প্রোগ্রামের মধ্যে খুঁজে বার করলো দু'টি বিখ্যাত ফিল্মের নাম। রোনাল্ড কোলম্যান, গ্রেগরি পেক, অ্যাভা গার্ডনার, সুসান হেওয়ার্ড এরা সব রয়েছে সেই দুই ফিল্মে, পঞ্চাশের দশকে এই সব তারকার নামের ডাকে গগন ফাটতো। টি. ভি. খোলা রইলো, জুলেখা জানালার পাশে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দিলো। আজ সারা দিন কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, সন্ধের পর পরিষ্কার আকাশ, ঝকঝকে নীল, দুধের মতন জ্যোৎস্না গড়াচ্ছে। রাস্তা দিয়ে চলছে অসংখ্য

গাড়ির স্রোত। এই শহরটাতে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী, তাই পথ দিয়ে হেঁটেও যায় অনেকে। কত বিচিত্র রঙের পোশাক।

এই রকম রাতে ড্রাইভ ইন সিনেমায় স্বামীর পাশে বসে যে কোনো ছবি দেখার যে আনন্দ তার সঙ্গে কি বাড়িতে বসে পুরোনো ক্লাসিক ফিল্ম দেখার কোনো তুলনা চলে?

এই সব ক্ষেত্রে নারী–পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন খাটে না। কামাল তো বুঝতেই পারতো না যে সে তার স্ত্রীকে কোনো ব্যাপারে বঞ্চিত করেছে। তা বলে যে জুলখা রাগ বা অভিমান করে রইলো তা নয়। অনেক রাতে সে পাশের ঘরে এসে দেখলো, টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো, কামাল কপালে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

জুলেখা তার পিঠে হাত দিয়ে নরম করে ডাকলো, এই শুতে চলো।

কামাল ধড়মড় করে জেগে উঠে বললো, দাঁড়াও, আর একটুখানি বাকি আছে, শেষ করে নিই। আর পনেরো মিনিট। কাল সকালেই টাইপ করে ভাউচারগুলো পাঠাতে হবে।

জুলেখা কোমল জেদের সঙ্গে বললো, না তোমার ঘুম এসে গেছে, কাল সকালে যেটুকু বাকি আছে শেষ করবে।

–কাল যে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

–আমি ভোরে উঠবো। আমি তোমাকে টাইপ করতে সাহায্য করবো।

কামালের বুকের মধ্যে দপদপ করে ওঠে। সেই যে কঠিন বলের মতন ভালোবাসা তার বুকের মধ্যে জন্মে গেছে, সেটা যেন আর একটু বড় হয়ে ওঠে।

দু'হাতে সে জুলেখার কোমর জড়িয়ে ধরে।

এর দিন তিনেক বাদে নিউ জার্সি থেকে ফেরবার পথে কামালের হঠাৎ মনে পড়ে, জুলেখা পল নিউম্যানের কী একটা ফিল্ম দেখার কথা বলেছিল না? কী যেন ফিল্মটার নাম? জুলেখা বুঝি পল নিউম্যানের ভক্ত? ঠিক আছে, পল নিউম্যানের যতগুলি ফিল্মের ক্যাসেট পাওয়া যায় সবগুলো সে একদিন ভিডিও লাইব্রেরি থেকে ভাড়া করে নিয়ে যাবে। আকাশ সেদিন মেঘলা, শিগগিরই আসছে পাতা ঝরার দিন।

কামাল জানে, জুলেখা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু তবু সে জুলেখার চরিত্র ঠিক মতন বুঝতে পারে না।

জুলেখা হাসতে জানে। হাসলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়। এক এক সময় সে এমন হাসিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে যেন একটা পাহাড়ি নদী হঠাৎ জলপ্রপাত হয়ে গেল। আবার সেই জুলেখাই যে কখন আকস্মিকভাবে গম্ভীর হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। নানা রকম মজার কথা শুনলেও তার প্রতিক্রিয়া হবে না।

কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ উঠে জানালার কাছে চলে যায়। কিংবা আয়নার সামনে দাঁড়ায়। তখন কামালের মনে হয় এ মেয়েটি এখনো তার খুব অচেনা।

সংসারের জন্য বাজারটাজার সব কামাল নিজেই করে। কখনো জুলেখাকেও সে নিয়ে যায় সুপার মার্কেটে। তার ব্যবসার অবস্থা যখন যেমনই থাকুক খরচের ব্যাপারে তার কোনো কার্পণ্য নেই। তবু জুলেখা এক একদিন বলে, তুমি সব জিনিস নিজে কিনবে কেন। আমি আমার ইচ্ছে মতন যা খুশি কিনতে পারি না।

কামাল বললো, নিশ্চয়ই পারো। তোমার যা খুশি কেনো। তোমার নামে ক্রেডিট কার্ড করে দিচ্ছি।

জুলেখা দোকানে ঘোরার সময় কামাল তার পাশে থাকে। গাড়ী ঠেলতে সাহায্য করে। জুলেখা কোনো দামি গায়ে–মাখা সাবান পছন্দ করলে কামাল বলে ওঠে, একটা কেন, দুইটা নাও।

একদিন সন্ধেবেলা কামাল বাড়ি ফেরামাত্র জুলেখা বললো, আজ আর কিন্তু কোনো কাজের কথা বলবে না। যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো। অন্য কোনো লোকজন আসার আগেই আমরা ডিনার সেরে নেবো।

কামাল বাথরুম থেকে বেরুতেই দেখে জুলেখার হাতে একটা নতুন শার্ট, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

এ কি, এই জামা কার?

তোমার, আবার কার।

নতুন জামা, আমার জন্য; কে কিনেছে? তুমি? আমার তো জামা অনেকগুলোই আছে।

তা থাক, তবু আমার ইচ্ছে হলো কিনেছি।

তুমি একা বেরিয়ে গিয়ে কিনলে? এ যে দেখছি দামি শার্ট। তুমি শুধু শুধু এতগুলো ডলার বাজে খরচ করলে?

আমার বুঝি কোনদিন তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে না? আজ তোমার জন্মদিন, তাও তো তুমি জানো না।

জন্মদিন! আমার!

সত্যিই কামাল তার জন্মদিনের কথা অনেক বছর খেয়ালই করে নি। ঢাকাতে সে ছিল একটি যৌথ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। এই বিদেশে ওসব কে মনে রাখবে!

জুলেখাই বা জানলো কী করে। কামাল তো কোনদিন বলেনি। মেয়েরা অনেক কিছুই জেনে যায়।

কামালের বুকের ভেতরটা আবার মোচড়াতে থাকে।

জুলেখার জন্মদিন কবে সেটা জেনে নিতে হবে গোপনে। সেদিন সে জুলেখার পায়ের কাছে সারা বিশ্ব উজাড় করে দেবে।

তাদের পরের বিবাহ বার্ষিকীর সময় কামাল আর কোনো কাজ রাখবে না। জুলেখাকে নিয়ে সে চলে যাবে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন কিংবা মায়ামি বিচ—এ। জুলেখা সেদিন কামালের জন্য বিশেষ যত্ন করে নানা পদ রান্না করে রেখেছে। কামাল যে সর্ষেবাটা দিয়ে মাছ ভালোবাসে তাই এখানে এসে নতুন করে মাছ রান্না শিখেছে।

আবেগে কামালের গলায় বাষ্প জমে গেল।

জুলেখার হাত জড়িয়ে ধরে সে বললো, জুলেখা, তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা। তুমি না আসলে আমার জীবনটা যে কী হতো কী জানি। তুমি আবার সব কিছু বদলে দিয়েছো। তোমাকে সাথে পেয়ে আমার এখন সব সময় মনে হয়, আমি অনেক বড় কাজ করতে পারি।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জুলেখা কৌতুকের সুরে বললো, তুমি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে তাকেও ঠিক এই কথা বলতে!

কামালের বুকে যেন দুম করে একটা বাইরের ধাক্কা লাগলো। এই মুহূর্তে জুলেখার কাছ থেকে সে এমন নিষ্ঠুর কথা প্রত্যাশা করে নি।

তুমি কেন এ কথা বললে, জুলেখা? তুমি বোধহয় জানো না, আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। এর আগেও আমার মা-বাবা অনেকবার জোর করেছিল, আমি রাজি হই নি। আমি তো নিছক একটি স্ত্রী চাই নি, যে শুধু রান্না করে দেবে আর....

তুমি কী করে জানলে আমি অন্য রকম?

আমাদের সম্বন্ধ হয়ে যাবার পর তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে। সেই চিঠিতেই তোমার মনের পরিচয় পেয়েছি। তারপর তোমাকে যখন দেখি তখনই বুঝেছি, তুমি আমার জীবনের গাইডিং লাইট হবে। দিনে দিনে সে বিশ্বাস আমার ক্রমশই বাড়ছে।

তুমি একটা পাগল।

কেন, আমি পাগল কেন? তুমি আমার জীবনের প্রথম এবং একমাত্র নারী। আগে কখনো বুঝি নি যে, কোনো মেয়ে কোনো পুরুষের জীবনকে এতখানি বদলে দিতে পারে। আচ্ছা জুলেখা, তুমি কি আমাকে ছাড়া আর কারুকে...

তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠে জুলেখা বললো, তুমি সত্যিই একটা পাগল! চলো খেয়ে নিচে চলো।

আর একদিন কামাল বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে জুলেখা ঘোর সন্ধেবেলা শুয়ে আছে বিছানায়, তার গালে শুকনো অশ্রুর রেখা।

এ কী জুলেখা, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে ?

না।

এমনভাবে শুয়ে রয়েছো কেন ?

এমনি।

কামাল জুলেখার কপালে বুকে হাত ছোঁয়ায়, উত্তাপ নেই। প্রাচ্য দেশীয়দের এখনো ধারণা অসুখ মানেই জ্বর! জুলেখার জ্বর নেই দেখে কামাল নিশ্চিন্ত হয়।

ব্যবসার কাজে কামালকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। প্রথম প্রথম কয়েকবার সে জুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না। সে কখন কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই। অনেক সময় কামাল তার স্টেশান ওয়াগানটার মধ্যেই রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে। নতুন বউকে তো সেভাবে রাখা যায় না। রোজগারের অবস্থা এমন নয় যে প্রায়ই বড় হোটেলে ওঠা সম্ভব। কামাল বাইরে গেলে জুলেখাকে একা থাকতে হয়। প্রবাসে একাকিত্ব বড় দুঃসহ। অবশ্য মীনা ভাবী আছেন, ইফতিকার, দুলাল, রুমি, জয়নাল এই সব অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরাও আছে। কামাল ওদের বলে রেখেছে, ওরা কোথাও বেড়াতে গেলে বা সিনেমা-থিয়েটারে গেলে যেন জুলেখাকে অবশ্যই নিয়ে যায়।

পেনসিলভানিয়া থেকে পাঁচদিন পরে ফিরছে কামাল। বাড়ি ফিরেই স্ত্রীর চোখে জল দেখলে কারুর মন সুস্থির থাকে না।

তুমি এর মধ্যে কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যাও নি জুলেখা?

জুলেখা এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বললো, আমি পড়াশুনোর জন্য ক্লাসে ভর্তি হবো না? সবাই একটা না একটা কোর্স নিচ্ছে, আমি শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকি, সময় কাটে না...

একটু থতোমতো খেয়ে গেলো কামাল।

তার স্ত্রী যদি পড়াশুনো করতে চায় তাতে কামালের আপত্তি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অবস্থাটা এখন তেমন অনুকূল নয়। পড়াশুনো করার খরচ আছে বেশ। পার্টটাইম চাকরি বা অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ যোগাড় করে অনেক মেয়ে পড়াশুনো চালায়। জুলেখার পক্ষে এর কোনোটাই এক্ষুণি যোগাড় করা সম্ভব নয়। কামালের হাতেও বেশি পয়সাকড়ি নেই। সে অনুনয়ভরা কণ্ঠে বললো, তুমি পড়বে, নিশ্চয় আমি তোমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেবো তবে আরও দু' একটা সেমেস্টার যাক। ইতিমধ্যে তুমি কী কী কোর্স নেবে তা ঠিক করে ফেলো। দেখছো ব্যবসাতে এক এক মাসে বেশ কিছু টাকা আসে, পরের মাসে আবার মূলধন পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। এখনো এ রকম আনসেট্‌লড অবস্থা। আমি আমার আব্বা-আম্মার কাছ থেকে কোনো টাকা নিতে চাই না, নিজের পায়ে দাঁড়াবো বলেই তো এ দেশে এসেছি। একটু সেট্‌লড হয়ে ব্যাঙ্কে যদি পাঁচ হাজার ডলার জমা রাখতে পারি, তারপর...

জুলেখা অবুঝ নয়, সে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই কামাল আবার আবিষ্কার করলো জুলেখার চোখের কোণ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে।

কামাল এবারে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। টাকা পয়সা সে গ্রাহ্য করে না। যেভাবেই হোক টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। জুলেখার যখন এতই পড়াশুনো করার ইচ্ছে তখন সে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে কোনো কলেজে ভর্তি করে দেবে।

জুলেখা তাতে রাজি নয় কিছুতেই। সে তো পড়াশুনোর জন্য কাঁদছে না। তা ছাড়া, সে তো কাঁদে নি, এমনিই চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে। কামাল যতই জোর করে জুলেখা ততই বেঁকে বসে। যে স্ত্রী তার স্বামীর টাকা পয়সার অসুবিধের কথা না বোঝে, সে আবার কিসের স্ত্রী? সে এখন কিছুতেই ভর্তি হবে না!

তবে সে কাঁদছিলো কেন?

কয়েকদিন ধরে কামাল সেই কথাই ভাবে। তারপর তার কারণ মনে আসে।

দেশ থেকে যেসব চিঠিপত্র ও কাগজ আসে তাতে জানা যায় যে দেশের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশে প্রায় অরাজক অবস্থা। শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে এলেও দেশটাকে সামাল দিতে পারছেন না। নুনের দাম কখনো পাঁচ টাকা তো চাল প্রায়ই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। মাছের দেশ বাংলাদেশ-এ মাছের দাম এরকম আকাশছোঁয়া হলো কেন? নিশ্চয়ই অধিকাংশ মাছ ভারতে চলে যাচ্ছে। যে মনোভাব নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সেই মনোভাব এখনো অনেকের মনে প্রবল। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে বাংলাদেশের জন্ম হওয়ায় অনেকেই প্রকৃত খুশি হয় নি। প্রতিবেশী অতিকায় ভারতের এ নিশ্চয়ই শোষণের ষড়যন্ত্র। শেখ মুজিব ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে পূর্বতন পাকিস্তানপন্থীদের মনে হয় ভারতের চাটুকারিতা।

কামালের ঘরেই মাহমুদুল আর বিশ্বজিতের মধ্যে এই নিয়ে প্রায়ই প্রবল তর্ক হয়। দু'জনে এমনিতে খুব বন্ধু। কিন্তু তর্কের সময় দু'জনেই কট্টর স্বদেশী। ওরা দু'জনে, দু'দেশের পক্ষ নিয়ে চোখাচোখা যুক্তির বাণ ছোঁড়ে। শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুরই মীমাংসা হয় না। মাহমুদুল বলে, ভারত আর বাংলাদেশের টাকার দামে এত তফাৎ কেন সেটার আগে জবাব দাও! বিশ্বজিৎ বলে বাংলাদেশ আর ভারতের সোনার দামের কত তফাৎ সে খবর রাখো না ?

আলোচনা যখন তপ্ত, খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন কামাল মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে, আরে শোনো, শোনো তোমরা তো বলছো দুই দেশের সরকারের কথা? কিন্তু সাধারণ মানুষ তো সব দেশেই সমান, তাই না! আমি তো সবখানে তাই-ই দেখেছি। ঢাকায় যেমন গরীব আছে, কলকাতাতেও তেমন গরীব আছে।

বিশ্বজিৎ বলে, কলকাতায় গরীবের সংখ্যা অনেক বেশি।

মাহমুদুল বলে, গরীবরাই তো নিজেদের মধ্যে বেশি লড়ালড়ি করে। দ্যাখো না, রাশিয়া-আমেরিকা যতই তড়পাক নিজেরা সরাসরি যুদ্ধে নামে না। যুদ্ধ হয় কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে, ইণ্ডিয়া-পাকিস্তানে।

সে যাই হোক, প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্বদেশের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন। বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার জন্য চোর-ডাকাত-সমাজবিরোধীরা তাণ্ডব চালাচ্ছে। যুদ্ধপরিত্যক্ত অস্ত্র রয়ে গেছে অনেকের কাছে, তাই কথায় কথায় খুন জখম। লুট-পাটের টাকায় কেউ কেউ হয়ে উঠেছে হঠাৎ বড়লোক, আর নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবীদের অবস্থা হয়ে পড়ছে শোচনীয়, গ্রামের চাষীরা মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় ধুঁকছে।

একটু লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েরা সামান্য সুযোগ পেলেই পালিয়ে আসছে দেশ ছেড়ে। তাদের মুখে শোনা যায় সব দুর্দশার কাহিনী। কামাল এই সব ছেলেদের সাহায্য করে তাদের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

জুলেখার বাবা নেই, মা থাকেন যশোরে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে। এই রকম বিপদের দিনে একা মহিলা কী ভাবে দিন কাটাচ্ছেন তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

জুলেখা তাহলে মায়ের কথা চিন্তা করেই কাঁদে!

ঢাকায় কামালের বড় বাড়ি, অনেক লোকজন। বিত্ত থাকলে নিরাপত্তারও অনেক ব্যবস্থা থাকে। দেশের এরকম অবস্থা হলেও কামালের বাড়ি থেকে যেসব চিঠিপত্র আসে তাতে সেরকম কোনো ভয়ের ছবি পাওয়া যায় না। জুলেখা একদিন সজল চোখে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, কামাল কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললো, মায়ের জন্য তোমার খুব মন কেমন করে, তাই না?

একটু যেন চমকে জুলেখা ফিরে তাকায়। মুখে পাতলা হাসি ফুটিয়ে বলে, ধ্যাৎ! মায়ের জন্য মন কেমন করবে কেন, আমি কি ছেলেমানুষ নাকি?

জুলেখা সদ্য একুশ বছরে পা দিয়েছে, তাকে এখনো প্রায় কিশোরীর মতনই দেখায়। প্রায়ই সে বলে, আমি ছেলেমানুষ নাকি? আমার একুশ বছর বয়স হয়েছে না?

কামাল বললো, না, তুমি ছেলেমানুষ না, তুমি একখানা বুড়ি! কিন্তু বুড়ি বয়েসে বুঝি নিজের মায়ের জন্য মন খারাপ হতে পারে না? তোমার আম্মার চিঠিও তো আসে নি অনেকদিন!

জুলেখা চুপ করে থাকে।

শোনো, আমি কিন্তু একটি ব্যবস্থা করতে পারি। যশোরে কখন কী হয় বলা তো যায় না। মনুকে নিয়ে তোমার আম্মা ঢাকায় আমাদের বাড়িতে এসে থাকতে পারেন। আমি আব্বাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা হবে না। আব্বাই যশোর থেকে ওদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন।

জুলেখা আহত বিস্ময়ে তার স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

আমার আম্মা তোমাদের বাড়িতে এসে থাকবেন কেন? তুমি কী পাগলের মতন কথা বলছো!

কেন কোনো অসুবিধা তো নাই।

অসুবিধা নাই মানে! শাশুড়ি হয়ে তিনি জামাইয়ের বাড়িতে এসে থাকবেন? তোমরা বড়লোক হতে পারো, কিন্তু তোমার কি ধারণা আমরা খেতে পরতে পাই না?

না, না, আমি সে কথা ভেবে বলি নি!

সব সময় সহজ সমাধানটাই কামালের মনে আসে, সামাজিক জটিল সম্পর্কের ব্যাপারটা সে বোঝে না। জুলেখার মৃদু বকুনিতে সে লজ্জা পেয়ে যায়।

তারপর আর একটি সমাধান তার মাথায় আসে!

শোনো, তাহলে আর একটা কাজ করা যায়। তোমার ছোট ভাই আর আম্মাকে এখানে নিয়ে এলে কেমন হয়?

জুলেখার আবার অবাক হবার পালা।

এখানে? আম্মা এখানে কী করে আসবেন?

কেন, টিকিট কেটে চলে আসবেন। আমি এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে নেবো। টিকিটের টাকাটা যদি ওখানে জোগাড় না হয় তারও ব্যবস্থা করা যাবে।

টিকিট কাটলেই বুঝি এখানে চলে আসা যায়?

আমি স্পনসরশীপ পাঠাবো। সেটা তো বলাই বাহুল্য আমার বাবা মাও তো এসে ঘুরে গেছেন।

আমেরিকা বেড়াবার পয়সা আমার মায়ের নেই।

বেড়াতে আসবেন কেন, এখানে থেকে যাবেন। ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে আসবেন।

তারপর এখানে ওদের খরচ চলবে কী করে?

তোমার মা তো লেখাপড়া জানেন। ওর জন্য একটা কিছু কাজ যোগাড় করা শক্ত হবে না। এখানকার চেয়েও ক্যানাডায় বেশি সুবিধা। প্রথমে কিছুদিন আমাদের কাছে থাকবেন; তারপর আস্তে আস্তে নিজেই সেট্‌ল হয়ে যাবেন।

জুলেখা একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, সত্যি এমন হতে পারে?

কেন হবে না? আমি কয়েকদিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে ফেলছি।

কামালের বুকে হাত রেখে গাঢ়স্বরে জুলেখা বললো, তুমি কী ভালো। তোমার মতন ভালো মানুষ আমি দেখি নি কখনো!

তোমার মা এলে তুমি খুশি হবে তো?

তুমি এক্ষণি যা বললে এর চেয়ে আনন্দের কথা আমি অনেকদিন শুনি নি। তুমি এত ভালো! আমার বরটা কী ভালো!

একটু বাদে বাড়ি থেকে বেরুলো কামাল। গাড়িটা স্টার্ট দিয়েই তার মনে পড়তে লাগলো জুলেখার ঐ কথাগুলো। এত সামান্য কারণে জুলেখাকে খুশি করা যায়?

কামাল গাড়ি চালাচ্ছে পাগলের মতন। লাল আলো মানছে না। বিপজ্জনকভাবে এক একটা গাড়ির পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। তার বুকের মধ্যে সেই গোলাকার জিনিসটা আরও বড় হয়ে লাপালাপি শুরু করছে। চিৎকার করে তার সবাইকে বলতে ইচ্ছে করছে, জুলেখা আজ খুশি! জুলেখা সুখী!

৩

মাজেদা খাতুন লেখাপড়া জানা মহিলা, কাজ-চালানো গোছের ইংরিজিও বলতে পারেন, এদেশে এসে মানিয়ে নিতে তাঁর বিশেষ অসুবিধে হলো না। তাঁর চরিত্রের জোর আছে। স্বামীর আকস্মিক নৃশংস মৃত্যুতেও তিনি ভেঙে পড়েন নি। ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে তিনি সংসারের হাল ধরেছিলেন। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে। এখন ছেলের লেখাপড়াই তাঁর প্রধান চিন্তা?

জামাইয়ের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এমন জামাই হয় না! সব সময় মুখে হাসি, কাজে কোনো ক্লান্তি নেই। শাশুড়িকে সে মায়ের মতন ভালোবাসে। মাজেদাকে সে ডাকে আম্মু বলে।

প্রথম কয়েক'দিন আনন্দ উত্তেজনায় কাটলো। তারপর ভবিষ্যতের চিন্তা। মাজেদার এখনও যৌবন যায় নি। শরীরের বাঁধুনি ভালো এবং আত্মসম্মানবোধ প্রখর। মেয়ে জামাইয়ের সংসারে তিনি বেশিদিন থাকতে চান না। কয়েকদিন থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তার জামাইটি যেমন ভালোমানুষ, তেমনই পাগল। ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরানোর দিকেই তার বেশি উৎসাহ। ব্যবসার কাজের জন্য তার দৌড়োদৌড়ি তো আছেই, তার চেয়েও সে বেশি দৌড়োদৌড়ি করে অপরের বেগার খাটার জন্য। প্রথম প্রথম মাজেদা এতে কৌতুক বোধ করতেন।

জুলেখা বাচ্চা মেয়ে, তার বরটাও বাউণ্ডুলে তাই ওদের সংসারটাও এলোমেলো। মাজেদা গুছিয়ে দিলেন সবকিছু। মেয়েকে বোঝালেন কী করে হিসেব করে খরচ চালাতে হয়। তারপর তিনি কামালকে বললেন, এবারে তুমি আমার ব্যবস্থা করো।

ক্যানাডায় নাগরিকত্ব পাওয়ার সুবিধা বেশি। মন্ট্রিয়েলে কামাল একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে এলো শাশুড়ির জন্য। তারপর একদিন তার স্টেশনওয়াগনে মালপত্র চাপিয়ে সদলবলে বোস্টন থেকে যাত্রা করলো মন্ট্রিয়েলের দিকে।

যেন সে একটি অভিযাত্রী দলের নায়ক। একটি মানব গোষ্ঠীকে সে নিয়ে যাচ্ছে নতুন দেশে ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে। সেখানে উপনিবেশ গড়া হবে। বংশ বিস্তার হবে।

চাকরি জোটানোর আগে বেবী সিটিং করেও যথেষ্ট উপার্জন করা যায়। এ দেশে ছোট চাকরিতেও অসম্মান নেই। রেস্তরাঁয় টেবিল মোছার কাজেও সংসার চলে যায়। মাজেদা খাতুন অবস্থাটা চট করে বুঝে নিলেন। প্রথম কয়েক সপ্তাহ যদি জামাইয়ের কাছ থেকে কিছু অর্থসাহায্য নিতেও হয় সেটা তিনি ধার হিসেবে গণ্য করবেন।

কামাল আর জুলেখা যখন বোস্টনে ফিরছে তখন মাঝপথে একটা ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে বসে মাছ ভাজা, আলু ভাজা খেতে খেতে জুলেখা হঠাৎ বললো, এই চলো না, আমরা কোথাও বেড়াতে যাই।

—বেড়াতে যাবে? হ্যাঁ চলো, কোথায় যেতে চাও?

—ইণ্ডিয়ায় চলো। আমি ভালো করে কলকাতা দেখি নি। আজমীর শরীফ দেখি নি? এখানকার মেয়েরা কলকাতা থেকে কত ভালো ভালো শাড়ি এনে পরে। মীনা ভাবী সায়েদাদের বাড়িতে পার্টিতে যে শাড়িখানা পরেছিলেন...

—তোমাকেও আমি অমনি শাড়ি কিনে দেবো। নিশ্চয়ই দেবো।

—ইণ্ডিয়ায় যাবে না আমাকে নিয়ে?

—যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। তবে এখন তো নয়। এখন তোমার মা এলেন।

—আমার আর একটা কী ইচ্ছে করে জানো। জাহাজে করে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে। চেনাশুনো আর কেউ থাকবে না।

—বেশ তো একটা ক্রুইজ নেওয়া যাবে'খন। দুই তিন সপ্তাহের ট্রিপ নেব।

WWW.BANGLABOOK.COM

—কবে যাবে?

—এখনই যেতে চাও! এখন তোমার মা এলেন এদেশে...যাবো, আমরা কিছুদিন পরে যাবো।

—ঠিক তো, কথা দিলে?

—বাঃ তুমি যা চাইবে, তা কখনো আমি না করতে পারি? তোমার জন্যই তো আমার সব, তা জানো না?

কামাল মনে মনে একটু অবাক বোধ করে। মা আর ছোট ভাইয়ের চিন্তায় জুলেখার চোখ ছল ছল করতো। এখন তারা এদেশে আসামাত্রই প্রায় জুলেখা তাঁদের ছেড়ে দূরে বেড়াতে যেতে চাইছে?

অবশ্য মানুষের মনের ইচ্ছে যে কত রকম হয় তার তো কোনো ঠিক নেই!

শাশুড়ি এসে পড়ায় কামালের অনেক সুবিধে হলো। এখন ব্যবসার কাজে তাকে যখন তখন বাইরে যেতে হলেও জুলেখা খুব একা বোধ করবে না। মন্ট্রিয়েল আর বস্টন কাছাকাছি না হলেও এদেশে ঐ দূরত্ব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। যখন তখন টেলিফোনে কথা বলা যায়। টেলিফোনের বিল যতই উঠুক কামাল তা গ্রাহ্য করে না। দিন রাতের মধ্যে যে-কোন সময়, যে-কোনো সমস্যা উঠলেই জুলেখা তার মাকে ফোন করে।

জুলেখার এক বান্ধবীও এসে পড়েছে বস্টনে! তার নাম মিতা। এর স্বামী সাজ্জা জহিরও মারা গেছে মুক্তিযুদ্ধে। দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের পরিবারের জন্য বাংলাদেশ সরকার কিছুই করে নি। বিধবা অবস্থায় মেয়েটি বেশ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। তারপর তার চাচা তাকে নিয়ে এসেছেন এদেশে।

মিতার সঙ্গে জুলেখার আগে অল্প পরিচয় ছিল, এখন তা পরিণত হলো প্রগাঢ় বন্ধুত্বে। ওদের দু'জনের গল্পের আর শেষ নেই। মিতা আর জুলেখার গল্পের মধ্যে কামাল এসে পড়লে জুলেখা বলে, এই তুমি আমাদের কথা শুনছো কেন? আমাদের অনেক প্রাইভেট কথা আছে।

মিতার চাকরির জন্য কামালই ব্যবস্থা করে দেয়। মেয়েটির মুখে একটা বিষাদের ছাপ। এমনিতে হাসি ঠাট্টার সময় মিতা প্রাণ খুলে হাসতে পারে, কিন্তু যখনই ও চুপ করে থাকে তখনই ওর মুখে সেই বিষণ্ণতাটা ফিরে আসে।

কামাল ভাবে, মিতা আবার বিয়ে করে না কেন? স্বামীর কথা ভুলতে পারছে না? কিন্তু বাঁচতে হলে তো মানুষকে ভবিষ্যতের দিকেই তাকাতে হয়, পেছন ফিরে থাকলে তো চলে না! আর একাকিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী দুর্বিষহ তা কামাল নিজেই এখন ভালো বোঝে। জুলেখাকে পেয়ে তার জীবনটা সম্পূর্ণ হয়েছে।

মনের কথা মুখে আসতে দেরি লাগে না কামালের। একদিন সে মিতাকে বলেই ফেললো, তুমি শুধু শুধু কষ্ট করে থাকো কেন, এবারে আবার বিয়ে করে ফেলো।

মিতা বললো, কে বললো আমি কষ্টে আছি?

একা থাকতে কি কারুর ভালো লাগে? তোমার শরীরের মনের ক্ষুধা আছে নিশ্চয়ই, তা মেটাতে ইচ্ছে করে না?

মিতা আর জুলেখা পরস্পরের দিকে চোখাচোখি করে হাসে।

জুলেখা বললো, যতিদন অন্য কারুকে না পায়, ততদিন তুমিই ওর শরীরের, মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দেবে নাকি? তোমার যে রকম আগ্রহ দেখছি।

কামাল একটু লজ্জা পেয়ে যায়। তার কথার এ রকম ব্যাখ্যা হলো? অবশ্য জুলেখা আর মিতা দু'জনেই উচ্চকণ্ঠে হাসছে, হালকা সুরেই জুলেখা একথা বলেছে।

একদিন কামাল কেমব্রিজের দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছে, দেখলো মিতা একা একা হাঁটছে রাস্তা দিয়ে। মুখের সেই বিষণ্ণতার সঙ্গে মিশেছে ক্লান্তির ছাপ। বৃষ্টি পড়ছে ঝির ঝির করে।

ঝট করে মিতার একেবারে গা ঘেঁষে গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিয়ে কামাল বললো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো।

মিতা প্রথম চমকটা কাটিয়ে উঠে বললো, কোথায় যাবো?

তুমি যেখানে যাবে। তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

না, না, তার দরকার নেই। হেঁটেই যাবো আমি।

কেন, হেঁটে যাবে কেন? আমি পৌঁছে দিচ্ছি তোমাকে।

কামাল ভাই, আপনি ব্যস্ত মানুষ, আপনি কেন আমার জন্য এই অসুবিধে করবেন, আপনি যান।

এটা পার্কিং-এর জায়গা নয়, কামাল হঠাৎ থেমে পড়ায় পেছনের গাড়ি আটকে পড়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে পুলিশ এসে টিকিট দেবে।

আরে, দেরি করো না, উঠে পড়ো বলছি!

মিতা অনিচ্ছুকভাবে, অনেকটা বাধ্য হয়েই উঠে পড়লো। ক্ষুব্ধ নালিশের চোখে তাকালো কামালের দিকে।

কামাল বললো, রেইন কোর্ট আনো নাই, একেবারে ভিইজা গেছো দেখছি। এদিকে হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিলে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মিতা বললো, কামাল ভাই, আপনি আমাকে এভাবে গাড়িতে তুললেন কেন, এটা আপনার ঠিক হয় নাই!

কামাল ভুরু তুলে বললো, কেন? তুমি ভিইজা ভিইজা যাচ্ছিলে তোমাকে লিফ্‌ট দিলে দোষের কী হলো?

এরকম একটু আধটু ভেজা আমার অভ্যেস আছে।

কিন্তু আমি তোমাকে লিফ্‌ট দিলে দোষের কী হলো?

আপনি সাদা মানুষ, আপনি কিছু বোঝেন না। কিন্তু চেনাশোনা অন্য কেউ যদি দ্যাখে যে আমি আপনার সঙ্গে গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছি।

হা-হা-হা, বেড়াচ্ছো কোথায়? আমি যাচ্ছি কাজে। রাস্তায় তোমায় দ্যাখলাম তাই লিফ্‌ট দিলাম।

কিন্তু অন্য কেউ কি তা বুঝবে? তারা ভাববে অন্য রকম। পাঁচ কথা রটাবে। আমার চাচার কানে যদি যায়, জানেন তো তিনি কী রকম কড়া মানুষ!

বড় অদ্ভুত তোমার কথা। একজন চেনা মানুষকে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যেতে দেখেও আমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাবো? অন্য কারুর সাথে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল নাকি? আমি ডিসটার্ব করলাম?

কামাল ভাই, আপনি কিছু বোঝেন না। জুলেখা শুনলেও তো কিছু ভাবতে পারে।

হা-হা-হা। বড় মজার কথা বলো তোমরা?

সেদিন বাড়ি ফিরেই কামাল হাসতে হাসতে জুলেখাকে ঘটনাটা জানালো। জুলেখা দুষ্টুমি করে চোখ পাকিয়ে বললো, হুঃ। হঠাৎ দেখা হয়েছিল না তুমি ঐ রাস্তায় ইচ্ছে করে গিয়েছিলে? জানতে যে মিতা ঐ সময়ে কাজে যায়?

মিতা তো ওখানে কাজে যায় না। আজই নাকি ওখানে একটা নতুন কাজ খুঁজতে গিয়েছিলো।

জানি জানি। মিতার কাছ থেকে আমার কোনো ভয় নেই।

ভয়? কিসের ভয়?

তোমাকে হারাবার ভয়।

আমাকে হারাবার? জুলেখা, আমি তো সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে দিয়েছি, তোমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে আছি।

যাকে সবচেয়ে আপন করে পাওয়া যায়, তাকেই তো হারাবার জন্য মানুষের বেশি ভয় হয়, তা জানো না?

কামালের আবার বুক কাঁপতে থাকে। বুকের মধ্যে সেই জিনিসটা দোলে। এত সুন্দর করে কেউ কিছু বলে নি যেন আগে।

জুলেখাকে সে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যায় শোবার ঘরে।

ইদানীং টাকা পয়সার বেশ টানাটানি যাচ্ছে কামালের, কিন্তু জুলেখাকে তা সে বুঝতে দিতে চায় না। জানতে পারলে জুলেখা ভাববে তার মায়ের জন্যই কামালের বেশি খরচ হয়ে গেছে।

ব্যবসাটাকে বাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কামাল, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। এ দেশে ফ্যাশান ঘন ঘন পাল্টায়। এ বছর সবাই চৌকো টেবল ম্যাট ব্যবহার করছে, পরের বছরই ফ্যাশান হয়ে গেল গোল টেবল ম্যাট। তখন আর চৌকো জিনিসটা কেউ ছুঁয়েও দেখবে না।

পাটের তৈরি এক রকমের ঝোলা ব্যাগ গত শরৎকালে খুব চালু হয়েছিল, এ বছর শীত পড়তেই সেই ব্যাগের কদর চলে গেল। দেশ থেকে সেই রকম এক সাদা ব্যাগ অর্ডার দিয়ে সদ্য আনিয়েছে কামাল, কিন্তু কোনো দোকান সেই ব্যাগ এখন রাখতে আগ্রহী নয়। কামাল প্রত্যেকদিন একটু করে দাম কমাচ্ছে, তবু বাজার পাচ্ছে না। সব যদি লোকসান হয় তবে সেটা সামলে ওঠা খুব কঠিন হবে তার পক্ষে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জুলেখা দেখে কামাল পাশে নেই। বাথরুমে আলো জ্বলছে না, কোথাও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

ধড়মড় করে উঠে বসে জুলেখা দেখলো বসবার ঘরে ক্ষীণ আলোর রেখা। অন্য রকম আলো।

পা টিপে টিপে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। মেঝেতে বসে কামাল এক মনে সুতোয় রং করছে। এই সুতো দিয়ে অন্য রকম ব্যাগ তৈরি হবে। বসবার ঘরের বড় আলোটা জ্বালে নি যাতে জুলেখার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। শোওয়ার ঘরের টেবল ল্যাম্পটা নিয়ে এসেছে।

কামালের পাশে যে রাশি রাশি সুতো তা রং করতে সারা রাত কেটে যাবে।

কাছে এসে জুলেখা বললো, তুমি আমায় ডাকো নি কেন?

ধরা পড়ে যাওয়া হাসি দিয়ে কামাল বললো, একি, তোমার ঘুম ভাঙলো কী করে ? আমি কি শব্দ করেছি?

তুমি জানো না, তোমার হাতের ওপর মাথাটা না রাখলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না? বালিশ আমার মাথায় কঠিন লাগে।

চলো, তাহলে এসব থাক এখন।

তুমি কেন আমায় ডাকো নি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।

না, না, এমন কিছু না আমি একাই শেষ করে দিতাম। কাল সকালে বাকিটা করলেই হবে।

তুমি এত খাটলে তোমার শরীরটা বইবে কী করে? কিছুদিন ব্যবসার কথা ছাড়ো তো, অন্যদিকে মন দাও।

আমার মন তো শুধু দু'টা দিকেই দিতে পারি। এক তোমার দিকে, আর ব্যবসার দিকে। আর তো অন্য কোনো দিক জানি না।

সেই যে বেড়াতে যাবার কথা বলেছিলাম।

যাবো, তা তো যাবেই। একটু ফ্রি হয়ে নিই। কিছু ভালো টাকা আসুক হাতে।

ব্যবসায় যখন টাকা পয়সার ঠিক নাই, তখন তুমি চাকরি করলেই পারো। এখানে তো দেখি চেনাশুনা সবাই চাকরি করে।

ধুর, চাকরি আমার ধাতে নাই।

অসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখেই কামাল বেশিনে হাত ধুয়ে জুলেখাকে নিয়ে শুতে চলে গেলো।

কয়েকদিন বাদেই মাজেদা খাতুন টেলিফোনে কামালের কাছে এই চাকরির প্রসঙ্গটা তুললেন। বোঝা যায় যে, মা-মেয়েতে আগেই এই বিষয়ে কথা হয়েছে।

মাজেদা বললেন, শোনো কামাল, তোমার ব্যবসায়ে খুব মন্দা চলছে শুনলাম। এদেশে এখন সব ব্যবসাতেই তো মন্দা, তাই না? টিভি-তে দ্যাখলাম এখন মোটরগাড়িও বিক্রি হয় না, সব জমা পড়ে আছে... ইকোনমিতে একটা ডিপ্রেশন চলছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই মাজেদা খাতুন মার্কিন-ক্যানাডা দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন। বাংলার চেয়ে ইংরিজি শব্দ বেশি বলেন। টিভি দেখে দেখে বুঝতে চান এই সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা।

শাশুড়ির একরম জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে কামালের মজাই লাগে।

মাজেদা বললেন, তুমি কত লোককে চাকরি জুটিয়ে দাও, তোমার কত রকম মানুষের সাথে এখানে খাতির আছে, তুমি ইচ্ছা করলেই একটা ভালো চাকরি পেতে পারো নিজের জন্য। ঠিক কিনা?

নিজের জন্য চাকরি?

ব্যবসায়ে যখন অনিশ্চিত অবস্থা কখন কী হয় ঠিক নাই, ধর যদি একদিনে হঠাৎ তোমার সব লস হয়ে যায়, তোমার নিজের সংসারটার কথাও তো ভাবতে হবে।

আপনি কী বলছেন, আম্মু। আমি হঠাৎ চাকরি খুঁজতে যাবো কেন?

আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি। আমি তোমাকে কোনো মন্দ উপদেশ দিতে পারি? বলো তুমি?

আপনি আমার মায়ের মতন, আপনি আমার ভালো তো চাইবেনই! কিন্তু আম্মু, চাকরি করা আমার ধাতে নাই। নিছক টাকা-কড়ির কথা হলে তো আমি দেশেই অনেক সুখে থাকতে পারতাম। দেশে আমার টাকা খায় কে? না না, আপনি বেশি চিন্তা করবেন না! ব্যবসা আমি দাঁড় করাবোই।

এখন যদি তোমার শ্লাম্প পিরিয়ড চলতে থাকে, তাহলে কিছু দিনের জন্য অন্তত একটা কাজ নিতে পারো। তুমি একটা চেষ্টা করলেই তো কাজ পাবে।

নিজের জন্য অন্য কারুর কাছে আমি কোনোদিন অনুরোধ করি নাই। আপনি ভয় পাবেন না, আমি আপনার মেয়েরে না খাইয়ে রাখবো না।

না, না, আমি সেকথা বলি নাই। আমি তোমার কথাই চিন্তা করছি বেশি। তোমার মনের ওপর যদি প্রেসার পড়ে।

আমি ঠিক আছি। আপনাদের ওদিকের সব খবর ভালো তো? যদি বলেন তো এই উইক এণ্ডে জুলেখাকে নিয়ে আপনাদের বাসায় ঘুরে আসতে পারি!

তাই চলে এসো না। তবে, এখন আবার খরচপত্তর করে আসবে।

আপনি কি ভাবেন আমার এতটুকুও সামর্থ্য নাই? আপনার আর্শীবাদে কামাল সব রকম অবস্থা কাটিয়েই আবার ওপরে উঠতে পারে। তা হলে ঐ কথা রইলো, এই উইক এণ্ডে দেখা হবে। খোদা হাফেজ!

খোদা হাফেজ!

কী করে যেন রটে যায় যে, কামালের ব্যবসা এখন গাঁড্ডায় পড়েছে। আরও দু-একজন শুভার্থী কামালকে চাকরি নিয়ে নিশ্চিত জীবন কাটাবার পরামর্শ দেয়। জুলেখাও সেই রকম ইঙ্গিত করে। তাতে কামালের জেদ আরও বেড়ে যায়।

শ্বেতাঙ্গদের দাসত্ব করার জন্য সে এদেশে আসেনি। নিজের দেশেও কোনো দিন চাকরির কথা চিন্তা করে নি সে। এখনো এখানকার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেলে সে আরামেই থাকতে পারবে, পারিবারিক ব্যবসার অংশ পাবে। কিন্তু কামাল হার স্বীকার করবে না কারুর কাছে।এই ব্যবসা তাকে দাঁড় করাতেই হবে। শুধু তার নিজের জন্য নয়। দেশে যে দশ বারোটি পরিবার তার পাঠানো নমুনা অনুযায়ী মাল তৈরি করে পাঠায় তারাও কামালের এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল।

কামাল দিনের পর দিন পরিশ্রম করতে লাগলো অসুরের মতন।

একদিন কামালের ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। বাইরে রোদ ঝলমল করছে। কামালের বেরুনোর কথা ছিল খুব ভোরে।

জুলেখা জেগেছে অনেক আগেই। এরই মধ্যে সে স্নান সেরে নিয়েছে। তার পিঠের ওপর ভিজে চুল খোলা। একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে সে, মুখখানি দেখাচ্ছে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতন।

কামাল অনুযোগের সুরে বলল, এ কি, তুমি আমাকে ডাকো নি কেন? ইস, কত দেরি হয়ে গেল। বাজে ক'টা এখন!

জুলেখা মুচকি হেসে বলল, আমি ইচ্ছে করে ডাকি নি। তুমি একটা শিশুর মতন ঘুমোচ্ছিলে। খেটে খেটে তুমি মরবে নাকি। তোমার বিশ্রাম দরকার।

আটটার সময় আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একটা।

চুলোয় যাক তোমার অ্যাপেয়েন্টমেট। পর্দা টেনে দিচ্ছি, তুমি আর একটুখানি ঘুমিয়ে নাও!

কামাল বিছানা থেকে নামতে নামতে বললো, পাগল নাকি! কাজ ফেলে রাখলে চলে!

জুলেখা তার সামনে এসে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে বললো, তুমি এরকম যদি করো, তাহলে রাত্রে তোমার দুধের সঙ্গে রোজ একটা করে ঘুমের বড়ি মিশিয়ে দেবো। তারপর দেখবো তুমি কী করে রাত জেগে কাজ করো আর ভোরবেলা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে যাও।

একজন মানুষ আর একজন মানুষ সর্ম্পকে এমন নিবিড় করে ভাবে জানতে পারলে যেন জীবনটা সার্থক হয়ে যায়। কামাল জুলেখার হাতটা নিয়ে নিজের গালে ছোঁয়ালে।

তারপর বললো, অনেকদিন বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি তোমাকে! সত্যি এত কাজ ভালো লাগে না। আজ সন্ধেবেলা আমরা একটা থিয়েটার দেখতে যাবো, কেমন? তুমি কোন্‌টা দেখতে চাও, বেছে রেখো।

জুলেখা বললো, কোনো ভালো থিয়েটারের টিকিট তোমার জন্য বসে আছে আর কি। দশ-পনেরো দিন আগে সব ফুল হয়ে যায়।

কামাল চওড়াভাবে হেসে বললো। টিকিটের চিন্তা তোমার করতে হবে না। আরে, তোমার এই স্বামীটির অসাধ্য কিছু নাই। থিয়েটারের টিকিট তো সামান্য ব্যাপার!

বস্তুত সেদিন কামালের কাছে টাকাও নেই। ব্যালান্স শূন্য। থিয়েটারের টিকিটের যথেষ্ট দাম। কিন্তু তাতেই বা চিন্তার কী আছে। বিকেলের মধ্যে টাকা যোগাড় করা যাবে না?

সব ঠিক হয়ে যাবে।

৪

জুলেখা এখন জুলি। এখন সে একা একা রাস্তায় বেরুতে পারে, বাসরুট সব চিনে গেছে। কোন্ শপিং মলে এখন সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্টে জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে সে খবরও সে রাখে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে ডিসকাউন্ট কুপন কেটে কেটে জমায়।

একবার সে নিজেই একা মন্ট্রিয়েল থেকে ঘুরে এল।

বরফ পড়ার সময় সে শাড়ি ছেড়ে প্রথম প্যান্ট পরলো। অমনি চেহারাটি বদলে গেল তার। শ্ল্যাক্স আর শার্টে তাকে অনেক বেশি স্মার্ট দেখায়। তার ইংরিজির অ্যাকসেন্টও বদলেছে। এখন সে হঠাৎ যশোরে ফিরে গেলে তার পুরোনো বন্ধুরা তাকে চিনতেই পারবে না।

বস্টনের পরিচিত মহলে জুলেখা বেশ জনপ্রিয়। এতদিনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে সে বেশ ভালো গান জানে। বিভিন্ন বাড়ির পার্টিতে তাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

একদিন দুপুরে বাড়ি ফিরে কামাল দেখলো, জুলি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ দিয়ে কাঁদছে।

কামালের বুকে একটা ধাক্কা লাগলো। কী হয়েছে জুলেখার? নিশ্চয় কোনো বিপদ!

সে তার পিঠে হাত দিয়ে অনেক করে ডাকতে লাগলো। জুলেখা কিছুতেই মুখ তোলে না।

কামাল ওর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলো। এমন কী ঘটতে পারে যাতে জুলেখা এতখানি দুঃখ পেতে পারে? ব্যবসায় যতই অসুবিধে হোক, কামাল তো তার কোনো ইচ্ছে অপূর্ণ রাখে না। খাওয়া দাওয়া সব ঠিকঠাক আছে, জুলেখার শাড়ি কেনা, কিংবা অন্য যা কিছু কিনতে চায় কামাল সব ঠিক তার হাতখরচ জুগিয়ে যায়। যখন ইচ্ছে করে তখনই সে মন্ট্রিয়েলে যেতে পারে মায়ের কাছে। কয়েক মাস ধরে সে তো বেশ ফূর্তিতেই আছে। তবু কেন এই কান্না?

কামালেরও কান্না পেয়ে যায়! ধরা গলায় সে বলে , জুলি, জুলি, তোমার কী হয়েছে, আমাকে বলবে না? আমি কোনো দোষ করেছি? যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, তুমি ক্ষমা করবে না?

হঠাৎ এক সময় মুখ ফিরিয়ে জুলেখা বললো, তুমি অমনি করছো কেন? আমার তো কিছু-হয়নি।

তুমি একা একা শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলে?

না তো! কাঁদিনি তো।

কী হয়েছে, সত্যি করে বলো। তোমার মা কিছু বলেছেন? দেশ থেকে কিছু খবর এসেছে?

সে রকম কিছু হয় নি, বলছি তো আমি কাঁদি নি!

আমি দেখলাম তুমি ফোঁপাচ্ছো, তোমার চোখে পানি ।

ও কিছু না, একটা বই পড়তে হঠাৎ মন খারাপ লাগলো।

কোথায় বই? কোন্ বইটা?

কাছাকাছি কোনো বই নেই, বই পড়ে কান্নার ব্যাপারটা কামালের ঠিক বিশ্বাস হলো না! কিন্তু জুলেখা কিছুতেই জানালো না তার কান্নার কোনো কারণ। সে বরং হাসতে শুরু করে দিলো। কামাল ঠাট্টা করে বললো, তুমি যদি এমন ব্যাকুল হয়ে যাও, তাহলে আমি মাঝে মাঝে মিথ্যে কান্নার ভান করবো।

ইউ গেট আপসেট সো ইজিলি। তুমি আমার জন্য এত ভাবো?

জুলি আমি যখন বাড়িতে থাকি না, বাইরে ঘুরে বেড়াই, তখন তোমার কথাই ভাবি।

সব সময় আমার কথা ভাবলে তোমার ব্যবসায় উন্নতি হবে কী করে? তুমি তো আমার প্রেরণা, তুমি খুশি থাকলে আমি রাজ্য জয় করে ফেলতে পারি।

ও শোনো, আজ মীনা ভাবী ফোন করেছিলেন, রাত্তিরে খেতে বলেছেন। তুমি যেতে পারবে তো? সারাদিন গাড়ি চালিয়ে এসে।

হ্যাঁ যাবো। গাড়ি চালাতে আমার ক্লান্তি আসে না। তৈরি হয়ে নাও।

মীনা ভাবীর বাড়িতে আলাপ হলো একটি নতুন ছেলের সঙ্গে। দেশ থেকে সদ্য এসেছে। তার নাম ওমর আলী। বেশ নম্র ভদ্র যুবক। কথা কম বলে। জানা গেল সে অঙ্কে খুব ভালো ছাত্র, আপাতত বস্টন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পেয়েছে, ইচ্ছে আছে হার্ভার্ডে ঢোকার। কামালের সঙ্গে তার ভাব জমতে দশ মিনিটও সময় লাগলো না।

ডঃ আজহার উদ্দীন একটা ক্যাডিলাক গাড়ি কিনেছেন, মীনা ভাবী সেই গর্বে একেবারে ডগমগ। তার মুখে গাড়ির গল্প আর ফুরোয় না। দেড় বছর আগে টরেন্টো যাবার পথে একখানা ক্যাডিলাক গাড়ি দেখে তার এমন পছন্দ হয়েছিল যে সেদিনই তিনি ঠিক করেছিলেন.......

মেয়েরা সবাই বসেছে এক পাশে! ছেলেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দু'জন ছাড়া আর সবার হাতেই নরম পানীয়।

বিশ্বজিৎ নিজেই হুইস্কির বোতল সঙ্গে করে আনে। সন্ধেবেলা একটু মদ্য পান না করলে তার মুখে নাকি খাদ্য রোচে না। মীনা ভাবী এজন্য আগে তাকে বেশ কয়েকবার সস্নেহ ভৎসনা করেছেন, এমন কি একথাও বলেছেন অন্য যেখানেই খাও আমার বাড়িতে ওসব চলবে না! এর উত্তরে বিশ্বজিৎ বলেছে, তাহলে আমাকে ডাকবেন না!

বিশ্বজিতের সঙ্গে চিয়ার্স করে মাহমুদুল। বিশ্বজিৎ তবু একটা জায়গায় থেমে যায়, কিন্তু মাহমুদুল মাত্রা রাখতে পারে না। প্রত্যেক পার্টিতেই তার পা টলে।

অনেকের ধারণা বিশ্বজিৎই মাহমুদুলকে এই বদ নেশাটি ধরিয়েছে। সে সৈয়দ বংশের ছেলে, তার পক্ষে ও বস্তু ছোঁয়াও তো হারাম। কিন্তু মাহমুদুল সগর্বে বলে, আমি ঢাকায় থাকতেই ড্রিংক করতাম। আমি সাহেবদের দেশে এসে শিখিনি। আমি রোজার দিনে সিগারেট খেয়েছিলাম বলে আমার বাবা একবার আমাকে পিট্টি দিয়েছিল খুব।

মাহমুদুল রোজা রাখে না, নামাজ পড়ে না, সে উগ্র বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী! সে চোখাচোখা কথায় অনেককে প্রায়ই আক্রমণ করে বটে, তবু অনেকে তাকে পছন্দ করে, করণ সে মানুষটি সৎ

এই দু'জনের মাঝখানে কামালের ভূমিকাটা বড় মজার। বিশ্বজিৎ বোতল বার করলেই কামাল দৌড়ে তাদের জন্য গেলাস আনে, সোডা পানি আনে, এমনকি নিজে বোতল থেকে গেলাসেও ঢেলে দেয়। অথচ সে নিজে কোনোদিন ঠোটে একবিন্দু স্পর্শ করেনি।

এমনকি একদিন কামালের বাড়িতেই মাহমুদুল হুইস্কির বোতলটা খুলতে গিয়ে হঠাৎ হাত ফসকায়ে বোতলটি মেঝেতে পড়েই চূর্ণ-বিচূর্ণ। দুই অতৃপ্ত মদ্যপায়ী ;তারপর যতক্ষণ আফসোসে হায় হায় করছে, তারই মধ্যে কামাল বেরিয়ে গিয়ে দোকান থেকে আর একটি বোতল কিনে এনেছে।

বিশ্বজিৎ সেদিন বলেছিল, কামাল ভাই, তুমি আজ সত্যি কামাল করলে! মাহমুদুল তো কামালের পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করে ফেললো। কামাল ভাই নিজে খাও না। অথচ আমাদের এতো সেবা করো, এর মর্ম বুঝি না!

তাতে কী হয়েছে? ঐ বোতলের জিনিসটা তো মানুষের খাবার জন্য বানানো হয়েছে, যার ইচ্ছে হয় খাবে, যার ইচ্ছে না হয় খাবে না। এতে আর অন্যদের কী বলার আছে?

তুমি তাহলে মদ খাওয়াটা দোষের মনে করো না? দোষগুণ সব তো নিজের ওপর। যে দোষ মনে করবে তার খাওয়া উচিত না।

তুমি যখন দোষ মনে করো না তবে তুমি একটু খেয়ে দেখো।

আমার ইচ্ছে হয় না। যদি কোনোদিন ইচ্ছা হয় সেদিন খাবো, হয়তো তোমাদের চেয়ে বেশিই খাবো।

কামালের সেবা পেয়ে ওদের এমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে যে নিজেরা আর জায়গা ছেড়ে নড়েই না। কামাল অন্য কোথাও থাকলেও ওরা হেঁকে বলে, কামাল ভাই, ফ্রিজ থেকে একটা সোডার বোতল এনে দেবে? বিশ্বজিৎ আর মাহমুদুলের নেশা ও তর্ক জমে উঠেছে বেশ, ওমর আলী তাদের পাশে বসে আছে চুপচাপ। কামাল তাকে জিজ্ঞেস করলে, আপনি খাবেন নাকি? গেলাস এনে দেবো ?

ওমর আলী বললো, না, আমি খাই না।

তর্ক থামিয়ে মাহমুদুল হঠাৎ বললো ও কামাল ভাই, আপনারকে একটা কাজের কথা বলা হয় নাই! ওমরের জন্য একটা থাকার জায়গা যোগাড় করে দিতে হবে যে! আপনার তো অনেক চেনাশুনা!

কামাল সঙ্গে সঙ্গে বললো হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কী রকম জায়গা চাই?

মাহমুদুল বললো, ওমর আমার কাছে এসে উঠেছে। তাতে আমার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ছয় মাসের জন্য ওয়েস্ট কোস্ট যাচ্ছি। আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিতে হবে। একা একটা অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাফোর্ড করা ওমরের পক্ষে সম্ভব নয়।

ডর্মে জায়গা পান নি?

পান নি। পেলে ডর্মে থেকে পড়াশুনোয় অসুবিধা হবে। ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনো ফ্যামিলিতে পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকতে পারে । রান্নাবান্নার ঝামেলা করতে হবে না!

নো প্রবলেম। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বিশ্বজিৎ ওমরের কাঁধ চাপড়ে বললো,ধরে নাও তোমার ব্যবস্থা হয়েই গেছে। কামাল সাহেবের মুখের কথাই যথেষ্ট। আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট তুমি যা চাও কামাল সাহেব এক নিমেষে হাজির করে দিতে পারে। সকলের হাস্যরোলের মধ্যে মীনা ভাবী এসে বললেন চলো, চলো, খাবার দেওয়া হয়ে গেছে, বোতল বন্ধ করো।

মাহমুদল বললো, ভাবী আর একটু, আর পাঁচ মিনিট।

মীনা ভাবী চোখ পাকিয়ে বললেন, মোটেই না। তোমার ফন্দি আমি জানি। এর পর আরও নেশা করবে, তারপর সব খাবার মুখে নিয়ে থুঃ থুঃ করে ফেলে বলবে লবণ পোড়া! অনেক কষ্ট করে রেঁধেছি। কামাল, তুমি এগুলোনরে উঠাও তো ।

মাহমুদুল তবু বললো, আজ গান হয় নাই। জুলেখা ভাবীর একখানা গান না শুনে আমি কিছুতেই যেতে যাবো না।

জুলেখাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হয় না, সে শোনালো দু'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানের সময় কামাল অন্য সকলের মুখের দিকে তাকায় তাদের মুগ্ধতায় সে নিজে বেশি মুগ্ধ হয়।

আজাহারউদ্দীন সাহেব কামালের পিঠ চাপড়ে বললেন, লাকি ডগ। তুমি ইচ্ছা হলেই কত সুন্দর সুন্দর গান শুনতে পারো। আমাদের বউগুলো কিচ্ছু গান জানে না। খালি শাড়ি আর গয়নার কথা, খালি শাড়ি আর গয়না...

যে-কোন পার্টি শেষে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ পার্টির লোকজনদের সম্পর্কে আলোচনা হয়। জুলেখা চমৎকার মিমিক্রি করতে পারে। শাড়ি বদলাতে বদলাতে সে দেখাচ্ছিল, মীনা ভাবী গাড়ির গল্প শোনবার সময় কী রকম করছিলেন চোখমুখ।

কামাল মীনা ভাবীকে সমর্থন করে বলে, না না, উনি খুব ভালো, মনটা খুব সরল কিনা।

জুলেখা বললো, আজ একজন নতুন মানুষ দেখলাম, এক কোণে চুপচাপ বসে ছিল।

ওর নাম ওমর আলী, তোমার সঙ্গে আলাপ হয় নাই বুঝি? মাত্র সপ্তাহখানেক আগে এসেছে।

দেখে মনে হয় সাধাসিধে ভালো মানুষ।

হ্যাঁ। পড়াশুনোতেও খুব ভালো, মানুষও ভালো। জানো, ওর একটা প্রবলেম হয়েছে। উঠেছে তো মাহমুদুলের ওখানে। কিন্তু মাহমুদুল অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর জন্য একটা থাকার জায়গা ঠিক করে দিতে হবে। আমাকে বললো!

তুমি অমনি দায়িত্ব নিয়ে নিলে তো?

আমি তো প্রায় বলেই ফেলেছিলাম যে, যে কয়দিন কিছু ব্যবস্থা না হয় আপনি আমার কাছে এসে থাকতে পারেন। তারপরই সামলে নিলাম। সেই যে তুমি বলেছিলে, এটা আমার একার বাড়ি নয়, তোমারও বাড়ি, তোমারে না জিজ্ঞেস করে কাউকে-ডেকে আনবো না।

ওনার পয়সা-কড়ি কিছু নাই বুঝি?

না, তা আছে! একা একখানা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকতে তো অনেক খরচ, সে পেয়িং গেস্ট হয়ে কোথাও থাকতে চায়, রান্নাবান্নার ঝামেলায় যেতে চায় না।

আমায় বুঝি রেঁধে খাওয়াতে হবে?

হা-হা-হা! আমি কি বলেছি যে তাকে আমাদের বাড়িতে রাখবো? আমি বলেছি জায়গা খুঁজে দেবো।

রাখতে পারো। আমার আপত্তি নাই। একস্ট্রা একটা রুম তো আছেই। পেয়িং গেস্ট রাখলে আমাদেরও কিছুটা সুবিধা হবে। তোমার ব্যবসা এখন ভালো যাচ্ছে না।

তুমি সে কথা মোটেই চিন্তা করো না। টাকা-পয়সার সুবিধার দরকার নেই। ব্যবসা আমি অনেকটা সামলে নিয়েছি। আঠাশ হাজার ডলারের একটা অর্ডার পাবো শীঘ্র, সেটা ঠিক মতন ডেলিভারি দিতে পারলে অনেকখানি মার্জিন থাকবে, একটা রিজার্ভ ফাণ্ড হয়ে যাবে।

সে টাকা তো এখনই পাচ্ছো না।

দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাবো। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি ওমর আলীকে কিছুদিনের জন্য এখানে এনে রাখতে পারি, যতদিন আর কোথাও কিছু ব্যবস্থা না হয়। তার কথা শুনে মনে হলো সে বাঙালী ফ্যামিলিই প্রেফার করে।

আমার আপত্তি নাই। কোনার রুমটা তো খালিই থাকে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ওমর আলী মালপত্র নিয়ে চলে এলো এ বাড়িতে। কিছুদিন পর তার জন্য আর অন্য জায়গা খোঁজার প্রশ্ন উঠলো না। ওমর আলী ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান। যে-কোন সংসারে সে সহজেই প্রিয় হয়ে যেতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তার কোনো বায়নাক্কা নেই। আবার সময়-অসময়ে বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে হৈ-হল্লা করার স্বভাবও তার নয়। সে পড়ুয়া মানুষ। অধিকাংশ সময় নিজের ঘরে বই নিয়ে কাটায়। এমনকি ছুটিছাটার দিনে যখন কামালের বাড়িতে অনেকেই আড্ডা দিতে আসে তখনও সে কিছুক্ষণ বাদেই আড্ডা ছেড়ে পড়তে চলে যায়।

ওমর আলী বিবাহিত, দেশে তার স্ত্রী-পুত্র আছে। পড়াশুনো শেষ করে ভালো চাকরি পেলে দেশ থেকে পরিবার নিয়ে আসবে, এই রকম তার পরিকল্পনা।

ওমর আলী কামালের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট। তাকে দেখেই কামালের নিজের ছোট ভাইয়ের মতন মনে হলো। এই ছেলেটি কষ্ট করে পড়তে এসেছে, একে সবরকম সাহায্য করা উচিত। এ ছেলে একদিন যদি খুব বুদ্ধিমান হয়, তাতে বাংলাদেশের তো সুনাম হবে।

ওমর আলীর স্বভাবে একটা গাম্ভীর্য আছে। তাকে চট করে তুমি বলা যায় না। কামালের মতন বিশ্ববন্ধুও তার সঙ্গে আপনি থেকে তুমিতে নামতে পারলো না।

নিজেই ব্রেক ফার্স্ট তৈরি করে খেয়ে ওমর আলী বেরিয়ে যায়, লাঞ্চটা সে সেরে নেয় বাইরেই কোথাও। ডিনারটা তারা একসঙ্গে খায়। সে সময় ওমর আলী রান্নার সাহায্য করতে চাইলে কামালই বাধা দেয় তাকে।

জুলেখাও প্রথম থেকেই পছন্দ করেছে ওমরকে। জুলেখা বয়েসে ছোট হলেও ওমর তাকে ভাবী এবং আপনি বলে সম্বোধন করে বেশ সম্মানের সঙ্গে। একজন লেখাপড়া জানা বড় পণ্ডিতের মুখে এই রকম ডাক শুনতে বেশ লাগে জুলেখার।

কিছুদিনের মধ্যেই বাড়িতে একটা ইস্কুল বসে গেল। ওমর সাহেবের কাছে নিয়মিত পড়াশুনা শুরু করলো কয়েকজন, তাদের মধ্যে যোগ দিলো জুলেখা। হাসেম, বাদল, নাসিম, জাহানারা এইসব ছাত্রছাত্রীরা আসে। শুধু মিতা আসে না। সে নিজে কাজ নিয়ে বিব্রত। জুলেখা একদিন অভিযোগ করলো কামালের কাছে, মিতাটা বড় পাজী হয়েছে! পরশু ওরে ডাকলাম আমাদের এখানে, সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করবো, তবু আসতে রাজি হলো না! কামালও যোগাযোগ করলো মিতার সঙ্গে, কিন্তু সঠিক উত্তর না দিয়ে মিতা যেন এড়িয়ে গেলো।

ওমরকে শহরের রাস্তাঘাট চেনাবার জন্য ছুটির দিন তার ছাত্র-ছাত্রীরা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। পার্কে, মিউজিয়ামে যায়। এই দলের সঙ্গে জুলেখা বেশ ফূর্তিতে থাকে।

অবশ্য ঐ শখের ইস্কুলটি বেশি দিন স্থায়ী হলো না। ওমর নিজের পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

দেশ থেকে দিন দিন আরও খারাপ খবর আসছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী, প্রায় দুর্ভিক্ষের মতন অবস্থা। এত প্রিয় নেতা—শেখ মুজিব সম্পর্কে সকলের অভিযোগ—তিনি দুর্নীতি দমনের তো কোনো চেষ্টাই করছেন না, বরং প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা যতই অন্যায় করুক, তিনি সেদিকে চোখ বুঁজে থাকেন। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তিনি যতখানি সার্থক ছিলেন, শাসনের পুরো দায়িত্ব পেয়ে তিনি ততটাই ব্যর্থ।

কামালের ইচ্ছে করে এই সময় একবার দেশে যেতে। কিন্তু জুলেখাকে এখানে রেখে একা যাওয়া সম্ভব নয়। জুলেখার এখন ঢাকা যাওয়ার আগ্রহ নেই। এখন বেড়াতে যাবার সময় নয়। বরং সে কামালকে বলে, আম্মা কি পাগলামি শুরু করেছেন, জানো তো? আম্মা বলেছেন, এখানে তো এখনো সে রকম কোনো চাকরি পেলাম না, দেশে ফিরে গেলে এখনও স্কুলের মাস্টারির চাকরিটা পেতে পারেন।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, সে চাকরির মাইনে ছিল কত?

ছ'শো টাকা।

আরে দূর! ছ'শো টাকা মানে তো ষাট ডলার; এখানে উনি যে কোনো কাজ করে কমপক্ষে মাসে দু'শো ডলার রোজগার করতে পারেন। সেই দু'শো ডলার থেকে কিছু টাকা জমে যাবে।

তুমি আম্মাকে বুঝিয়ে বলো!

ঠিক আছে, আজই টেলিফোন করছি। কিংবা এক কাজ করলে তো হয়। চলো মন্ট্রিয়েল ঘুরে আসবে নাকি? মাসখানেক তো যাই নি।

চলো! বাসে যাবো, না গাড়িতে?

গাড়িতেই যাই। তুমি গ্যাসের খরচের কথা চিন্তা করছো? হা-হা-হা, তোমার স্বামীর অবস্থা আবার ভালো হয়ে গেছে।

তুমি তো তোমার ব্যবসার কথা কিছুই আমাকে বলো না। যখন তুমি এখানে থাকো না, তখন তো আমিও কিছু কিছু কাজের ভার নিতে পারি। প্রথম প্রথম তুমি আমাকে বুঝাতে..

ঠিক বলেছো, এখন থেকে অর্ধেক ভার নেবে। আসলে কী হয়েছিলো জানো! খারাপ সময়টায় তোমাকে আর দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি!

আহা-হা-হা! তুমি বুঝি একাই দুশ্চিন্তা করবে! আর শোনো, একটা কথা। তুমি যখন দূরে যাও, তখন আমার ট্রান্সপোর্টে খুব অসুবিধা হয়। তুমি আমাকে গাড়ি চালানো শিখাও না কেন?

ঠিক আছে, তুমি আজ থেকেই ড্রাইভিং শিখতে শুরু করো। চলো, মন্ট্রিয়েলে যাবার সময় তুমি প্রথম লেসন্ নেবে। ওমর সাহেব যাবে নাকি? গাড়িতে জায়গা তো থাকছেই, নিয়ে যেতে পারি।

জিজ্ঞেস করে দেখো!

ওমর আলী অবশ্য যেতে রাজি হলো না। উইক এণ্ডেও তাকে পড়াশুনো করতে হবে।

মন্ট্রিয়েলেও কামালের চেনাশুনোর সংখ্যা অনেক। এখানে সে অনেকদিন থেকেছে। মন্ট্রিয়েলেই কামাল একটা ধাক্কা খেল।

ডঃ আজাহার উদ্দীন এবং মীনা ভাবীও বেড়াতে এসেছেন এখানে। ওসমান সাহেবের বাড়িতে দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। মীনা ভাবী কামালকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কামাল, তুমি কাজটা কী ভালো করলে?

—কোন্ কাজটা?

—আহা, জানো না যেন। অনেকেই বলাবলি শুরু করেছে। ঐ যে ঐ ছেলেটি, ওমর আলী, ওকে তুমি তোমার বাড়িতে নিয়ে রাখলে, এ কাজটা কী ঠিক হলো?

কামাল হকচকিয়ে গিয়ে বললো, কেন? ওমর অতি ভদ্র, সজ্জন। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই? আলাপ করে দেখুন, আপনার খুব পছন্দ হবে। পড়াশুনায় খুব মাথা।

রাখো ঐসব কথা। তোমার বাড়িতে তোমার অল্পবয়েসী সুন্দরী স্ত্রী, তুমি বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকো না। কথায় বলে না, ঘি আর আগুন পাশাপাশি রাখতে নাই।

আপনি এটা কী কইলেন ভাবী? জুলেখা একটা সরল মেয়ে, আমাকে সে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, তার সম্পর্কে আপনি এরকম সন্দেহ করলেন? আর ওমর আলীও অতি ভদ্র, দায়িত্ববান।

রাখো তো ঐসব কথা। কইলাম যে ঘি আর আগুন পাশাপাশি রাখতে নাই।

শোনেন! আমার আম্মা আমাকে ঘি পাঠিয়েছে, সে ঘিয়ের বৈয়াম আমাদের স্টোভের পাশেই থাকে। কই কিছু তো হয় না। আগুন তো লাফিয়ে গিয়ে ঘি পুড়িয়ে দেয় না।

বৈয়ামের মধ্যে রেখেছো, সেটা আলাদা কথা।

ঐ বৈয়ামটাই হলো আমাদের সম্ভ্রান্তবোধ, বিশ্বাস, আত্মসম্মান।

তোমার মা তোমারে ঘি পাঠিয়েছেন। এই বউও তো তোমার মা পাঠিয়েছেন। তা বলে মানুষের সঙ্গে কি কোনো জিনিসের তুলনা হয়?

আপনি তো ঘি আর আগুনের তুলনা দিলেন।

শোনো কামাল, আমি তোমারে সাবধান করে দিলাম। তুমি যদি আমার কথা শুনতে না চাও...

ভাবী, মানুষকে এত অবিশ্বাস করা ঠিক নয়। ওমর আলী থাকার জায়গা পাচ্ছিল না, তাই আমি তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। এটাই আপনারা দোষ ধরছেন? জুলেখা আর আমার পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে...

আমার যা মনে হয়েছে তাই বললাম। এখন তুমি বিবেচনা করে দেখো!

ভাবী, হঠাৎ আপনি আজ এই কথাটা বললেন কেন? আপনাকে কি আর কেউ কিছু বলেছে?

না, আর কেউ কিছু বলে নাই। আমি তোমার ভালো চাই বলেই........

নিশ্চয়ই, তা আমি জানি। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনারা দেশে যে সোসাইটি দেখে এসেছেন, এখানে তো আমরা সেরকমভাবে থাকি না। এখানে আমরা অনেক বেশি ফ্রি।

তোমার থেকে অনেক বেশি দিনই আমি এখানে আছি, কামাল। তুমি আমাকে এখানকার সোসাইটির কথা শিখিও না। ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

কামালের মনটা খানিকটা খিঁচড়ে গেল। মীনা ভাবী সম্পর্কে তার মনে সত্যিই একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল। কিন্তু মেয়েদের মন এত জটিল হয় কেন? নিজের দেশের একটি ছাত্রকে বাড়িতে আশ্রয় দিলেই ঘি আর আগুনের কথা উঠবে? ওমর আলীর বদলে কোনো মেয়েকে যদি বাড়িতে রাখা হতো, তাহলে কি মীনা ভাবী কামালের চরিত্র সম্পর্কেও সন্দেহ করতেন! কামালের মনে পড়লো মিতার কথা। মিতাকে সে একদিন রাস্তা থেকে তুলে গাড়িতে লিফ্‌ট দিয়েছিল, তাতেই মিতা বলেছিল, তাদের পাশাপাশি এক গাড়িতে দেখলে চেনা মানুষেরা কুকথা রটাবে। আশ্চর্য, এ দেশে থেকে, এ দেশের মানুষজনের জীবনযাত্রা দেখেও এদের মন পাল্টায় না।

মিতা আর বেশি আসে না তাদের বাড়িতে। কেন?

সেই রাতে জুলেখার পাশে শুয়ে কামাল প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করে জুলেখাকে বলেই ফেললো কথাটা। সে কোনো কথা পেটে চেপে রাখতে পারে না, বিশেষত জুলেখার কাছে কিছুই লুকোয় না। হাসতে হাসতেই কামাল বললো কথাটা।

জুলেখা দুঃখিত বা বিস্মিত হলো না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো, আমাকেও একজন ঐ কথা বলেছে।

কে?

তার নাম জানার কিছু দরকার নেই তোমার! তবে আমাদেরই একজন আপনজন।

আম্মু?

না, না, আমার আম্মা কিছু বলেননি, এখানকার অন্য একজন, সে বললো, কাজটা নাকি ভালো করো নি তুমি। ও নাকি আমাদের সংসারে গণ্ডগোল লাগাতে পারে।

যে বলেছে সে কি ওমর আলীকে চেনে?

না। কোনোদিন চোখেও দেখে নি।

আশ্চর্য, একজন মানুষকে না জেনেশুনেও লোকে তার নামে অপবাদ দেয়? সব মানুষ কি একরম হয়? মানুষের মধ্যে ভালো-খারাপ আছে না? আমি অবশ্য কোনো মানুষকে একেবারে খারা মনে করি না, সবই নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। হ্যাঁ, আর কী বললো সে?

ঐ মীনা ভাবী তোমাকে যা বলেছেন, সেই একই কথা। বললেন হিন্দুরা বাড়ির বউয়ের সঙ্গে অনাত্মীয় কারুর আলাপ করায় না পর্যন্ত।

এখানকার হিন্দুদেরও কি সেই রকমই দেখছে সে? গৌতম ব্যানার্জির স্ত্রী রত্না ব্যানার্জিকে কে না চেনে? গৌতমের চেয়ে রত্নাকেই বেশি লোকে চেনে। একবার একটা ফ্যাশানে নেচেছিলো!

শোনো, লোকে যদি বিশ্রী কথা রটায়, তা হলে বরং ওমর সাহেবকে চলে যেতে বলাই ভালো!

ওমরকে আমরা তাড়িয়ে দেবো? কেন, কী দোষ করেছে সে?

তাকে অন্য কোনো জায়গায় ঘর খুঁজে দাও!

তাকে আমি কী ভাবে চলে যেতে বলবো? কোন্ কারণটা দেখাবো?

বলবে যে ব্যবসার জিনিসপত্তর রাখার জন্য আমাদের বেশি জায়গা লাগবে। কিছু মালপত্র নিয়ে এসে একদিন ডাইনিং রুমে জমা করো। তারপর বলবে, আমাদের এখন দু'খানা ঘরে কুলায় না।

জুলি, লোকে আজেবাজে কথা বলছে বলেই আমরা একজন নির্দোষ মানুষকে বিদায় করে দেবো? ওমরকে আমি ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি, আমাদের কাজে সে কতরকম সাহায্য করে, ঠিকঠাক পরামর্শ দেয়।

তা হলে কী করবে?

আমরা দু'জনে যদি ঠিক থাকি, তাহলে অন্য লোকের কথা গ্রাহ্য করবো কেন? আমরা কি পরস্পরকে কোনোদিন অবিশ্বাস করতে পারি!

তুমি একটু কাছে সরে এসো। লোকের কথা শুনলে আমার ভয় হয়। কী জানি, যদি অন্যায় অপবাদ দেয়।

দূর ওসব কথা ছাড়ো তো! তোমার আম্মা তো বলেন নি কিছু?

আম্মা বলেছে, তোমাদের সংসার তোমরা যা ভালো বুঝবে তা-ই করবে। তবে, একটি ছাত্রকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে আমি তো দোষের কিছু দেখি না। এ দেশে কত ফ্যামিলিতেই তো পেয়িং গেস্ট রাখে!

আম্মু ঠিকই বলেছেন, তিনি বুদ্ধিমতী, তাঁর মধ্যে বাজে সংস্কার নাই! আমি আগেও অনেকবার বুঝেছি। আম্মু যখন নিষেধ করেন নি তখন আমি অন্য লোকদের কথা গ্রাহ্য করি না। ওমরকে আমি শুধু শুধু চলে যেতে বলবো না!

ওমর সাহেব একদিন কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন, ভাবী, আপনার সাথে আমার ভাই-বোনের সম্পর্ক পাতাতে ইচ্ছে করে। আপনাকে ঠিক আমার ছোট বোনের মতন লাগে। আপনাকে দেখলেই আমার বোনের কথা মনে পড়ে।

ভাই বোন পাতাবারই বা কী দরকার। দেওর-ভাবীর সম্পর্কও তো কত মধুর!

জুলেখা কামালের গালের ওপর গাল রেখে বললো, তুমি কী ভালো! তোমার মতন মানুষ হয় না। জানো, তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তার ঠিক আগে, শবে-বরাতের দিন আমি সারা রাত্র জেগেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম যে, আল্লা, ঐ কামালের সঙ্গেই যেন আমার শাদী হয়।

কামাল হাসতে হাসতে বললো, এই, তুমি যে একদিন বলেছিলে আমার যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলেই তাকে আমি একইরকম ভালোবাসতে পারতাম। আর তোমারও অন্য কোন লোকের সঙ্গে বিয়ে হতে পারতো।

বলেছিলাম নাকি? কবে বলেছিলাম? অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে আমি তাকে মেরে ফেলতাম!

তারপর দু'জনে হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকে।

৫

নিউ জার্সিতে একটা ট্রেড ফেয়ার হবে, তাতে অংশগ্রহণ করতে চায় কামাল। এখানে কিছু কিছু ভারতীয় জিনিসপত্রের চাহিদা হয়েছে। সেইসব জিনিস আনার জন্য কামালের একবার ইণ্ডিয়া যাওয়া দরকার।

জুলেখাকে রেখে যেতে হবে। জুলেখা আর ওমর আলী থাকবে। এই নিয়ে অন্য লোকদের জিভ একেবারে লক লক করে উঠবে। কামাল তা জানে। যার যা ইচ্ছে বলুক, তাতে কিছু যায় আসে না। জুলেখা আর সে পরস্পরের কাছে সত্যবদ্ধ। এ সম্পর্কে জুলেখাকে কিছু বললেই সেটা তার প্রতি অবিশ্বাস বলে মনে হবে।

এ বাড়ির অন্য একটি অ্যাপার্টমেন্টে রফিকুল সাহেবরা থাকেন। তাঁদের দুই ছেলেমেয়ে, সিরাজুল আর বেবী। ছেলেমেয়ে দু'টি প্রায়ই আসে জুলেখার কাছে। সিরাজুল তো কামালের খুব ভক্ত, সেও বড় হয়ে চাকরি না করে কামালের মতন ব্যবসা করবে ঠিক করেছে।

বেবী এসে রোজ রাত্রে জুলেখার সঙ্গে শুতে পারে। সিরাজুলও ইচ্ছে মতন পড়াশুনা করার জন্য থাকতে পারে এখানে।

কিন্তু কামালের ইণ্ডিয়া যাওয়ার প্রস্তাব শোনামাত্র জুলেখা বললো, সে, তা হলে ঐ কদিন মন্ট্রিয়েলে গিয়ে তার মায়ের কাছে কাটিয়ে আসবে। ছোট ভাইয়ের পড়াশুনোর কিছুটা সাহায্য করার দরকার।

জুলেখাকে মন্ট্রিয়েলে পৌঁছে দিয়ে কামাল চলে এলো ইণ্ডিয়ায়। দিল্লী-কলকাতা ঘুরে কয়েকদিনের জন্য গেলো বাংলাদেশে। সেখানকার অবস্থা সত্যি বেশ সংকটজনক। একদিকে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা, অন্যদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি রীতিমতন উত্তপ্ত। চতুর্দিকে অসন্তোষ। এরই মধ্যে আবার কিছু লোকের হাতে প্রচুর টাকা, তাদের বিলাসবহুল জীবন যাপন নবাব-বাদশাদের মতন। বিরাট একটা যুদ্ধ সহ্য করার পর অধিকাংশ দেশে এমনই হয়।

কামালের চেনা তরুণ ছেলেরা কামালকে ঘিরে ধরলো। তারা সকলেই বিদেশে চলে যেতে চায়, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না, কামাল তো ইচ্ছে করলেই তাদের সাহায্য করতে পারে।

কামাল বিভ্রান্ত বোধ করে। দেশের ভালো ছেলে সবাই যদি বিদেশে চলে যায়, তাহলে দেশটা চলবে কী করে? দেশের কথা কেউ এখন চিন্তা করে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সব মেধাবী ছাত্রদেরই লক্ষ্য ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা বা ক্যানাডা অথবা পশ্চিম জার্মানি। যারা তেমন লেখাপড়া শেখেনি তারা যাচ্ছে আরবদেশে। রাঁধুনি, ড্রাইভার বা ঝাড়ুদারের চাকরি নিয়ে। ইণ্ডিয়া থেকে এরকমও অনেক লোক যাচ্ছে। কিন্তু ইণ্ডিয়া বিরাট দেশ, কয়েক হাজার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিদেশে পাড়ি দিলেও হাতির গায়ে আঁচড় লাগে না।

কামাল এদের কিভাবে সাহায্য করবে? এতজনকে বিদেশে নিয়ে যাবার সাধ্য তো সত্যিই তার নেই। এরা এখানে ব্যবসা-ট্যাবসার চেষ্টা করলেও সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ব্যবসার কথা শুনলেই অনেকে পিছিয়ে যায়। অধিকাংশ বাঙালীই একটু লেখাপড়া শিখে ব্যবসায়ীদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব দেখায়। ব্যবসায়ী মানেই যেন অশিক্ষিত। কেউ উঁচু চাকরি পেলে সবাই ধরে নেবে যে সে একজন শিক্ষিত। পালিশওয়ালা লোক। সুতরাং মধ্যবিত্ত বাঙালীর চাকুরিই ধ্যান-জ্ঞান।

কামাল বুঝতে পারে, কেন জুলেখা আর তার মা একসময় তাকে চাকরি নেবার জন্য ঝুলোঝুলি করেছিলো।

কেউ কেউ মিন মিন করে বলে, কামাল ভাই, আপনি বিজনেসের কথা বলতাছেন, ব্যবসা করতে তো কেপিটাল লাগে। আমরা সেই কেপিটাল পাবো কোথায়? আপনের মতন তো আমাদের বাড়ির টাকা নাই।

কামাল হাসতে হাসতে বলে, আমি বাড়ির টাকা নিয়া বিজনেস করতে যাই নাই। কত টাকা লাগে মনে করো তোমরা? একশো টাকা দিয়া বিজনেস শুরু করা যায়। সে টাকাও নাই তোমাগো? ঠিক আছে, আমি প্রত্যেককে একশো টাকা করে লোন দিব। কী করতে হবে তাও বলে দিব। কাজ শুরু করবে?

কেউ সেই একশো টাকা নিতে এগিয়ে আসে না।

কামালদের বাড়ির দু'তিনখানা বাড়ির পরেই থাকে তার দূর সম্পর্কের এক দিদি। এই দিদির ছেলে ফজল মামুদকে কামাল ছেলেবেলা থেকেই খুব ভালোবাসে। ফজলের ডাক নাম টাইগার, ছেলেবেলা থেকেই সে অতি দুরন্ত। কত রকম দুষ্টুমি করে যে সে মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে তার ঠিক নেই। কিন্তু তার দুর্দান্তপনার মধ্যেও একটা সারল্য আছে। সেইজন্য তাকে পছন্দ না করে পারা যায় না।

যখনই কামাল দেশে আসে তখন টাইগার তার সঙ্গ ছাড়ে না। সে বারবার কামালকে বলছে, কামাল ভাই করে আমেরিকা নিয়ে যাবে বলো! আমি কিন্তু বেশিদিন থাকবো না, শুধু কিছু লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে ফিরে আসবো!

কামাল প্রত্যেকবারই বলেছে, হবে হবে। আমি এসে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

টাইগারের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হলেও সে মন দিয়ে পড়াশুনো করেনি। গ্রামে জমি-জমা আছে। বায়তুল মোকাররমের কয়েকখানা বড় দোকানের শেয়ার আছে, তাতেই চলে যায়। জামা কাপড়ের ব্যাপারে টাইগার খুব সুন্দর সৌখিন, তাতে যথেষ্ট পয়সা খরচ হয়। টাইগারের চেহারা খুব সুন্দর, ভালো পোষাক তাকে মানায়।

এবার টাইগারের সঙ্গে একদিনও দেখা হলো না।

কামালের মিষ্টি আপ্পা মারা গেছেন। টাইগার বিষয় সম্পত্তির পুরোপুরি মালিক হয়ে দু'হাতে টাকা উড়াচ্ছে। তার মাথায় চেপেছে গাড়ির শখ। একটার পর একটা গাড়ি কেনে, কয়েক দিন পরেই বিক্রি করে দেয়। খুব ছোটবেলায় এই টাইগারকে কামাল প্রায় কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। টাইগার সম্পর্কে তার বিশেষ দুর্বলতা আছে। সেই টাইগার একবারও দেখা করতে এলো না তার সঙ্গে, কামাল নিজে গিয়ে দু'বার খোঁজ নিল, তাও দেখা মিললো না, সে নাকি একদিন আগে চট্টগ্রাম চলে গেছে। ছোট্ট জায়গা, টাইগার নিশ্চয়ই কামাল আসার খবর পেয়ে গিয়েছিল। দেশের এরকম অবস্থায় টাইগার শুধু গাড়ি কিনে কিনে টাকা নষ্ট করছে, এতে কামালের বেশ দুঃখ হলো। পাছে কামাল ভর্ৎসনা করে সেই ভয়েই কি টাইগার এলো না!

কামালের মা-বাবাও কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় বেড়াতে যেতে চান। দেশের এই ডামাডোল, এখন কিছুদিন দূরে থাকাই ভালো। কামাল নানাভাবে বুঝিয়ে বললো, আরও দু'এক মাস পরে আসবার জন্য।

বস্টনে ফিরে এসে কামাল দেখলো ওমর আলী তার অ্যাপার্টমেন্ট একেবারে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে। এমনকি যে ইলেকট্রিক ঘড়িটা খারাপ হয়েছিল সেটাও ঠিক করে নিয়েছে সে। এইরকম লোকের হাতে বাড়ির ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যায়। জুলেখা এলে কোনো অভিযোগ করতে পারবে না।

এয়ারপোর্ট থেকে কামাল ফোন করেছিলো, তারপর বাড়ি আসতে যতটা সময় লাগে তার মধ্যে ওপর ভাত আর গ্রাউণ্ডবীফের তারকারি রান্না করে ফেলেছে তার জন্য।

তার জন্য কেউ কিছু করলে কামাল সব সময়ই অপ্রস্তুত বোধ করে। তার নিজেরই তো সব কিছু করা অভ্যেস। কামাল বারবার অনুযোগ করতে লাগলো। ওমর সাহেব, আপনি কেন এসব করতে গেলেন, আমার ক্ষুধা নাই, অনেক টাইম ছিল, আমি নিজেই কিছু বানিয়ে নিতে পারতাম।

ওমর হাসতে হাসতে বললো, এই যে এবারে আপনি এতদিন বাইরে রইলেন, তাতে এটাই তো আমার লাভ হলো। আমি কিছু রান্নাবান্না শিখে গেলাম। ভাবী থাকলে তো আমাকে কিচেনে ঢুকতেই

দ্যান না! বলেন, আপনার রান্না করার কী দরকার, আপনি পড়াশুনা নিয়ে থাকেন, ওসব আমরাই দেখবো। আপনি খানই বা কতটুকু!

ওমর যে শুধু ঘরদোরই টিপটপ করে ফেলেছে তাই-ই নয়, কামালের অনুপস্থিতিতে যত লোক তার ব্যবসার ব্যাপারে খবর নিয়ে টেলিফোন করেছে,তা সব কিছু সে নিখুঁতভাবে লিখে রেখেছে একটা কাগজে। প্রত্যেককে যথাযথ উত্তর দিয়েছে। এতে কামালের অনেক সুবিধে হবে।

এই রকম মানুষের সম্পর্কে লোকে অন্যায় সন্দেহ করে। লোকের কি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই!

কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছে গেল জুলেখা। সে একাই দিব্যি চলে আসতে পারে। কামালের মনে হলো, এই তিন সপ্তাহের মধ্যে জুলেখা যেন আরও বেশি রূপসী হয়েছে। চোখেমুখে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য।

কামাল নিজেও যথেষ্ট সুপুরুষ কিন্তু সে কথা তার মনে থাকে না। জুলেখা কিন্তু তার রূপ সম্পর্কে সচেতন। একদিন সে দারুণ একখানা সবুজ রঙের জর্জেট শাড়ি পরেছিল, তা দেখে বাদলা বলেছিল আজ ভাবীকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এর উত্তরে জুলেখা বলেছিল, সুন্দরকে সুন্দর তো দেখাবেই, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে!

কথাটা কামালের কানে খট করে লেগেছিল। এরকম কথা জুলেখাকে মানায় না। কামাল ভেবেছিলো, জুলেখাকে নিষেধ করবে এরকম উত্তর দিতে। কিন্তু বলা হলো না। মেয়েদের এরকম একটু আধটু দুর্বলতা থাকেই। জুলেখা অবশ্য ব্যবসার কাজে কামালকে এখন অনেক বেশি সাহায্য করে। টাকা পয়সার হিসেব বুঝতে শিখেছে। কামালের সঙ্গে সে একটা ট্রেড ফেয়ার ঘুরে এলো।

একদিন কামাল শুনতে পেল ওমর আর জুলেখা আড়ালে তুমি তুমি করে কথা বলে। প্রকাশ্যে অবশ্য জুলেখাকে ভাবী, আপনি বলেই ডাকে।

ওরা দু'জন প্রায় সমবয়সী, পিঠাপিঠি ভাই বোনের মতন মাঝে মাঝেই খুনসুটি আর ঝগড়া করে। তুমি বলাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সামনাসামনি বোধহয় এখনও লজ্জা ভাঙে নি। কামালের মনে হলো কিছুদিন পরেই ভেঙে যাবে। কামাল নিজেই তো এখনো ওমরকে তুমি বলতে পারে না।

আর একদিন কামাল শুনলো ওমর জুলেখাকে আড়ালে শুধু তুমি বলে না, লেখু বলে ডাকে।

জুলেখার ডাকনাম জুলি, কিন্তু ওমর তাকে অন্য একটা নাম দিয়েছে। এটা তার নিজস্ব নাম। কিন্তু সামনে ঐ নামে ডাকে না কেন? জুলেখাই বা এই কথাটা কেন বলে নি কামালকে!

কামালের মনটা খচখচ করে। সারাদিন ঘুরেফিরে ঐ কথাই মনে আসে। ওরা দেওর-বৌদি মিলে আলাদা একটা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক তৈরি করেছে, কামালকে বাদ দিয়েছে তার থেকে। আগে তো এরকম ছিল না, আগে তো সব মজা তিনজনে মিলে ভাগ করে নিতো!

প্রথমে অভিমান হয়, তারপর রাগ। অন্য একটা প্রসঙ্গে কামাল জুলেখার ওপর মেজাজ দেখিয়ে ফেলে। টাকা পয়সা হিসেবের সামান্য গরমিলে জুলেখাকে সে বকাবকি করে। জুলেখা অবাক হয়, আহত হয়। তারও তেজ কম নয়, কামাল বকলে সেও উত্তর দিতে ছাড়ে না।

দু'দিন বাদে কামালের আত্ম উপলব্ধি হলো, সে কি জুলেখাকে সন্দেহ করছে? তার কি মনে ঈর্ষা জন্মেছে? ছি, ছি, এটা তো ঠিক নয়? বিশ্বেসের ওপরেই তো মানুষের সম্পর্ক দাঁড়ায়। জুলেখা আর সে পরস্পরকে বিশ্বাস করে, এই ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সময় হলে জুলেখা তাকে ঠিকই বলবে। আগে থেকে সে জুলেখাকে অন্যায় সন্দেহ করছে।

একদিন ওমর বললো, কামাল সাহেব, একটা কথা বলবো? আপনার কি টাকার টানাটানি চলছে?

কামাল অবাক হয়ে বললো, কই না তো!

তারপর একটু হালকা করে বললো, কেন, আপনার খাওয়ার কিছু অসুবিধে হচ্ছে নাকি। জুলি বুঝি আপনাকে ঠিক মতন খাওয়াচ্ছে না? আপনি শ্রিম্প ভালবাসেন।

না, না, খাওয়ার কথা হচ্ছে না। খাবার আমি খুব ভালোই পাই। আপনি টেলিফোনে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, স্যরি, আমি ওভারহিয়ার করে ফেলেছি, আমি তখন কাবার্ড থেকে একটা জিনিস খুঁজছিলাম।

ও সিরিয়াস কিছু না।

আপনি বলছিলেন যে, ক্যাশ টাকার অভাবে আপনার জরুরী কাজ আটকে যাচ্ছে।

একটা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট পাবার কথা, সেটা এসে পৌছায়নি কিনা, সেটা পেয়ে গেলেই।

সেটা কবে পাবার কথা?

কামিং উইকের মধ্যে নিশ্চয় পেয়ে যাবো।

কামাল সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলবো?

হ্যাঁ, বলুন।

আমার কাছে নয় শো ডলার আছে! সঙ্গে রেখেছিলাম, যদি হঠাৎ কোনো কাজে লাগে। সেই টাকাটা আমি আপনাকে দিতে পারি।

আরে, কী আশ্চর্য কথা! আপনার টাকা আমি নেবো কেন? না না সেরকম কিছু দরকার নেই।

আপনি বলছিলেন ক্যাশ টাকার জন্য আপনার কাজ আটকে যাচ্ছে। আপনি আমার টাকাটা নিয়ে কাজ চালিয়ে দিতে পারেন না? আপনার ব্যাংক ড্রাফ্‌ট যখন এসে যাবে, তখন তো ফেরত দিয়ে দেবেন।

ওমর সাহেব, টাকাটা আপনি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য রেখেছেন, ওটা আপনার কাছেই রাখুন।

এখন তো বিশেষ প্রয়োজন কিছু হচ্ছে না। আপনি বলেন, আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতন, আপনি আমার কাছ থেকে একটু সাহায্য নিতে পারেন না? আমার সঙ্গেও ফর্মালিটি করেন!

এরপর আর না বলা যায় না। ওমরের কথায় সে অভিভূত হয়ে পড়ে। আজকালকার দিনে কেউ নিজে থেকে যেচে টাকা দিতে চায় না। কামালের টেলিফোনের কথা ওভারহিয়ার করে ওমর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। জুলেখা কোথায় যেন গিয়েছিলো, সন্ধেবেলা সে ফিরতেই কামাল তাকে সব কথা খুলে বললো।

জুলেখা বললো, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ওমর সাহেব আমার চেয়েও তোমাকে বেশি পছন্দ করেন। তোমাকে সত্যিকারের ভালোবাসেন। তুমি যখন থাকো না, তখন আমার কাছে প্রায়ই বলেন, কামাল সাহেবের মতন মানুষ আর হয় না!

কামাল বললো, সে নিজে ভালো কিনা, তাই সবাইকে ভালো দেখে।

শোন তুমি কিন্তু ওর টাকাটা ঠিক সময়ে শোধ করে দিও!

এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার ব্যাংক ড্রাফ্‌ট এসে না পৌছায়, আমি গাড়ি বিক্রি করে ওনার টাকা শোধ করে দেবো!

কামাল তার কথা রেখেছিলো। গাড়ি বিক্রি করতে হয়নি অবশ্য, অন্য জায়গা থেকে যোগাড় করে এনে ঠিক সময়ে দিয়েছিল ওমরের টাকা।

সামনেই ওমরের পরীক্ষা, এখন তাকে রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার দিকে তার বিশেষ মনোযোগ নেই। জুলেখা বলে, না খেয়ে খেয়ে ওমর সাহেব রোগা হয়ে যাচ্ছেন। কামাল অবশ্য ততটা বুঝতে পারে না, তাছাড়া এ দেশে রোগা হওয়াটাই তো সবাই ভালো বলে মনে করে। কত নারী-পুরুষ আপ্রাণ সাধ্য সাধনা করে রোগা হবার জন্য।

খাবার টেবিলে জুলেখা প্রায়ই ওমরকে খাওয়া নিয়ে জোরাজুরি করে। ওমর তবুও খেতে চায় না। কামাল এক এক সময় বলে, আহ্ অত জোর করো না, জুলি। উনি যেটুকু পছন্দ করবেন, সেটুকু খাবেন ঠিকই।

ওমর যে দুধও খেতে চায় না, সেটা সত্যি আশ্চর্য কথা। এদেশে দুধ অতি অপূর্ব। শুধু পুষ্টিকর নয়, স্বাদও চমৎকার। কেউ কেউ তো এক লিটার ঠাণ্ডা দুধ যখন তখন খেয়ে ফেলে। একমাত্র যারা মদ্যপায়ী তারা দুধ পছন্দ করে না। কিন্তু ওমর তো মদ ছোঁয় না। দুধ খাওয়া নিয়ে প্রায়ই ওমরের সঙ্গে জুলেখার কাজিয়া বেঁধে যায়।

একদিন রাত্রে শোওয়ার পর জুলেখা বললো, জানো আজও ওমর সাহেব দুধ খায়নি। আমি দিয়েছিলাম, ফেলে রেখে গেছে। রাত্তির তিনটা-চারটা পর্যন্ত জেগে পড়ে এমনি করলে শরীর টিকবে! দাঁড়াও, ওকে দুধ খাওয়াবো-ই আমি। আসছি! তুমি ঘুমিয়ে পড়োনা যেন!

জুলেখা দুধের কারটেন নিয়ে ওমরের ঘরে চলে যায়।

এটা কামালের পছন্দ হয় না। এত রাত্রে একজন পুরুষ মানুষের বেডরুমে ঢুকে দুধ খাওয়ানো যেন জুলেখার বড় বেশি বাড়াবাড়ি।

তারপরই ভাবে, জুলেখা এখনও ছেলেমানুষ, সরল, কোন্‌টা ভালো দেখায়, কোন্‌টা মন্দ দেখায়, তা ঠিক বোঝে না। আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলতে হবে। তবু তার মন থেকে ক্ষোভ যায় না। খানিকবাদে ফিরে এসে যখন হাসতে হাসতে ওমরকে দুধ খাওয়ানোর গল্প বলতে শুরু করে তখন তার একটুও ভালো লাগে না শুনতে। সে রুক্ষ স্বরে বলে ওঠে, বাতিটা নিভিয়ে দাও!

এরপর প্রায়ই জুলেখা রাত্তিরে ওরকম দুধ খাওয়াতে যেতে শুরু করলো। ডাইনিং টেবিলে ওমর দুধ ফেলে রেখে চলে যায়। ঘরে শুতে এসে জুলেখার সেই কথা মনে পড়ে, সে বেরিয়ে যায় আবার।

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর বিছানায় শুলেই কামালের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। জুলেখা ফিরতে দেরি করে। কামাল জেগে থাকতে পারে না। একটুখানি ঘুমিয়ে কামাল আবার চমকে জেগে ওঠে। কতক্ষণ কেটে গেছে সে জানে না। জুলেখা এখনও ফিরেনি। পাশের ঘরে কোনো কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে না, একেবারে নিঃশব্দ।

হঠাৎ অসম্ভব রাগ হয়ে যায় কামালের। জুলেখার এ কি ন্যাকামি? এতক্ষণ কী করছে সে? ইচ্ছে করে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে জুলেখার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসে।

সে জুলেখার নাম ধরে ডাকলো। কোনো উত্তর নেই।

কামাল তবুও ওঠে না, তার বুকটা জ্বলতে থাকে।

একটু বাদে জুলেখা ফিরলে সে উগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কী করছিলে?

জুলেখা চুলের ক্লিপ খুলতে খুলতে বললো, এতক্ষণ মানে? এই তো গেলাম। কিছুতেই দুধ খাবে না, আমিও না খাইয়ে ছাড়বো না, বলেছি রোজ তিন গ্লাস অন্তত খেতেই হবে।

—শোনো জুলি, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো। লোকে শুনলে কী বলবে?

—কি করেছি?

রোজ রাতের বেলা একজন পুরুষের ঘরে যাওয়া। খুব ইনডিসেন্ট দেখায়। অন্য কেউ যদি শোনে!

প্রস্ফুটিত গন্ধরাজের মতন মুখখানি ফিরিয়ে সারল্য মাখা চোখে পরিপূর্ণভাবে কামালের দিকে তাকালো জুলেখা। তারপর গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, ওমর সাহেব আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারের মতন। তাঁর ঘরে যাওয়া অপরাধ? অন্য লোক শুনলে...অন্য লোককে কে বলবে, তুমি?

অনুতাপে কামালের সব রাগ জল হয়ে যায়।

এই মেয়েকে সে ভুল বুঝছে? জুলেখা তো অবিশ্বাসের কিছু করে নি। কামাল নিজেই যেন চুক্তিভঙ্গ করতে যাচ্ছিলো। এরকম ঈর্ষা তার এলো কোথা থেকে?

জুলেখা বিছানায় এসে কামালের বাহুতে মাথা রেখে ম্লান গলায় বললো, তুমি যদি নিষেধ করো, তাহলে আর যাবো না।

কামাল অপরাধী হয়ে গিয়ে বললো, না, না। আমি নিষেধ করবো কেন? বলছিলাম যে, রাত্তিরবেলা ওর পড়াশুনোর সময় ডিসটার্ব না করে আগেই যদি খাইয়ে দিতে পারো।

তবুও কামালের মন থেকে একেবারে ক্ষোভ মুছে যায় না। অবিশ্বাস নয়, ঈর্ষা নয়, অন্য একটা অনুভব। এ বাড়ির দু'জন পুরুষ মানুষের মধ্যে জুলেখা এখন ওমরকে বেশি যত্ন করছে। কামালও মাঝে মাঝে দুধ খেতে ভুলে যায়। কামাল পরীক্ষা দিচ্ছে না বটে, কিন্তু তাকেও তো সারাদিন বিস্তর খাটাখাটুনি করতে হয়। জুলেখা তো তাকে দুধ খাওয়ার জন্য জোর করে না!

কয়েকদিন বাদেই চিঠি এলো, কামালের মা-বাবা আসছেন।

চিঠি পড়ে জুলেখা বললো, এই সময়ে আসছেন? এখন ওমর সাহেবের পরীক্ষা, এখন যদি বাড়িভর্তি লোক থাকে—তুমি লিখে দাও না, আর কিছুদিন পরে আসতে।

কামাল একটু কঠিন হয়ে গিয়ে বললো, শোন জুলি, আমার আব্বা-আম্মা আমার বাড়িতে আসতে চাইছেন, আমি কি অন্য লোকের জন্য তাদের বারণ করতে পারি? তারা জানেনেই না যে আমাদের এখানে পেয়িং-গেস্ট রয়েছে?

জুলেখা বলল, আমাকে তাহলে কিছুদিনের জন্য মন্ট্রিয়েলে পাঠিয়ে দাও!

সে কি!

কেন, কিছুদিন ঘুরে আসি না।

কি পাগলের মতন কথা বলছো। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি অত দূর থেকে আসবেন, আর তুমি সে সময় থাকবে না!

আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না!

ওরকম জিদ্দির মতন কথা বলো না, তুমি অত বাচ্চা নও।

তুমি আজকাল প্রায়ই আমাকে ধমকে ধমকে কথা বলো।

স্যরি, আই অ্যাম স্যরি। না, আমি তোমাকে বকি নি, কিন্তু তুমি বোঝার চেষ্টা করো, এই সময় কি তোমার চলে যাওয়া ভালো দেখায়?

কিসে যে কী ভালো দেখায় আর মন্দ দেখায়, তা আমি বুঝি না।

যথাসময়ে কামালের বাবা-মা এসে পড়লেন।

বাবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এক সময় তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে একটি বিশাল পরিবার প্রতিপালন করেছেন, অনেক সম্পত্তিও করেছেন। এখন নিরালায়, চুপচাপ থাকতে চান। বাইরের ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামান না।

কামালের মা একটি একান্নবর্তী পরিবারের কর্ত্রী। অনেক দিক সামলে চলতে হয় তাঁকে, সবদিকে তাঁর নজর। তিনি মানুষের মুখ দেখেই তার চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেন। প্রথম নজরেই তিনি ওমরকে অপছন্দ করলেন।

ওমরের ব্যবহারে কোন ত্রুটি নেই! বয়স্কদের সঙ্গে সে বিনীতভাবে, সম্মান দিয়ে কথা বলে। কিন্তু তাতেও কামালের মায়ের মন গললো না।

প্রথম দিনই সন্ধেবেলা মা কামালকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আরে, তুই এটা কি করেছিস? বাড়িতে আর একটা সোমথ পুরুষ ঢুকিয়েছিস? ও যে তোর সংসারের সর্বনাশ করবে!

কামাল মিটিমিটি হাসতে লাগলো। তার মনে পড়লো মীনা ভাবীর কথা। সব মহিলাদের মনের গড়নই কি একরকম? এরা নারী-পুরুষের একটিই সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে পারে।

মা বললেন, ঘি আর আগুন কেউ পাশাপাশি রাখে? বোকা ছেলে, আমি ভাবলাম, এদেশে এসে বুঝি তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে!

কামাল আবার হাসলো। ঘি আর আগুন, ঠিক মীনা ভাবীরই ভাষা।

তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলদের মতন হাসছিস কেন? আমার কথা তোর কানে যাচ্ছে না?

আম্মা, তুমি ভুল করছো, ওমর অতি ভালো ছেলে। আমাকে অনেক সাহায্য করে।

রাখ্ তো তোর ভাল ছেলে। ওসব আমার ঢের দেখা আছে। ওরা হলো ঘাসের ভিতর সাপ। উপকার করে। ঐ উপকারের ছুতোতেই তোদের সংসারে আগুন লাগাবে।

আম্মা, কয়েকদিন থাকো, ছেলেটিকে দেখো ভাল করে। আগেই এত কঠিন কথা বলছো কেন? মানুষকে কি প্রথম থেকেই অবিশ্বাস করতে হয়?

আমার বেশি দেখার দরকার নেই! তোমার বউকেও আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। ঢাকায় যা কাণ্ড হতে যাচ্ছিল, ভাবলে আজও আমার বুক কাঁপে।

ঢাকায় কি কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। জুলেখা কিছু করেছিল?

করে আবার নাই। আমি বারবার আল্লাকে ডেকেছি, হে আল্লা, একটা কেলেংকারি যেন না হয়! বিয়ের পর তুমি যে কয় মাস বউকে নিয়ে যাও নাই, ততদিন আমি ভালো করে ঘুমোতে পারি নাই।

তুমি কি বলছো, আম্মা? জুলেখা কি করেছিলো? তুমি তা আমাকে কোনদিন একটুও আভাস দাও নাই? এই যে কিছুদিন আগে দেশে গেলাম...

ভেবেছিলাম, সব চুকেবুকে গেছে, আর তোমায় কিছু বলে কাজ নাই, তুমি শুধু শুধু দুঃখ পাবে। এখন এখানে এসে দেখি আর এক আপদ জুটেছে।

জুলেখা কি করেছিলো খুলে বলো।

তোমার ঐ যে পেয়ারের টাইগার, যাকে তুমি মাথায় করে নাচো, সে ঘন ঘন আসতো বাড়িতে। তার সঙ্গে তোমার বউয়ের আশনাই হতো। সে কি নির্লজ্জ ঢলাঢলি! আমি টাইগারকে বকেছি, তোমার বউকে বকেছি তবু কি শোনে! লোক জানাজানির ভয়ে আমি বেশি চ্যাঁচামেচি করতে পারি নাই!

কামালের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। টাইগার? যে টাইগারকে সে বাচ্চা বয়স থেকে দেখছে, কত আদর করেছে, কত জিনিসপত্র দিয়েছে, কামাল ভাই, কামাল ভাই বলতে যে অজ্ঞান ছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে? এও কি সম্ভব? জুলেখা একদিনও ঘুণাক্ষরেও বলে নি টাইগারের কথা। প্রথম প্রথম এসে সে কাঁদতো, সে কি টাইগারের জন্য!

কিন্তু জুলেখা তো প্রথম দিনই কামালকে বলেছিলো তাকে তাড়াতাড়ি ঢাকা থেকে বস্টনে নিয়ে যেতে। এখানে এসেও তো সে একবারও আর ঢাকায় যেতে চায়নি। তা হলে?

কামাল বিমূঢ়ভাবে বললো, আম্মা, তুমি এসব কি বলছো, এ হতে পারে না।

আমি কি তোকে মিছা কথা বলছি?

জুলেখা ভালো মেয়ে, তুমি তাকে পছন্দ করে এনেছো।

দেখেশুনে তো ভালোই মনে হয়েছিলো! পরে বুঝেছি, ওর মায়ের শিক্ষা ভালো নয়।

ওর মায়ের আবার কি দোষ দেখলে?

অত কথা এখন থাক। সেখানে যা হয়েছিল তা তো চাপা পড়ে গেছে, এখন এটাকে সরাও।

চাপা পড়ে গেছে মানে কি! আমি সব শুনতে চাই!

শোন্, বউয়ের হয়তো অতটা দোষ ছিল না, টাইগার প্রথমে গায়ে পড়ে ভাব করেছে। তারপর দু'জন দিনরাত গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর।

জুলেখা ঢাকা ছেড়ে চলে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

আর বেশিদিন থাকলে চারদিকে টি টি পড়ে যেতো! এখানে এসেও তো টাইগারকে চিঠি লিখেছে।

কে বললো তোমাকে?

টাইগার নিজেই বলেছে। আর কে বলবে? তার তো লজ্জা শরম বলতে কিছু নাই, সে তো গাড়ি কেনে আর এই সব করে বেড়ায়।

মিথ্যে কথা! এসব মিথ্যে কথা!

অত জোরে চ্যাচাবি না, কামাল। আমি তোকে যা বলি শোন্। ঢাকায় যা হয়েছে, তা হয়েছে, সে সব মন থেকে মুছে ফ্যাল্। এখানে তোর সুখে শান্তিতে থাকলেই আমাদের সুখ। ঘরের মধ্যে দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষিস না?

ওমরের কোন দোষ আমি দেখি নাই।

বাবা এসে পড়ায় এই আলোচনা থেমে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো কামাল। তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

টাইগার? টাইগার এরকম করবে? তার বিশ্বাস হয় না।

জুলেখা তার কাছে এতসব গোপন করে যাবে? তার বিশ্বাস হয় না।

বিয়ের পর সে ঢাকায় বেশ কয়েক মাস ছিল। নিয়মিত সে কামালকে চিঠি লিখেছে। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ছিল কামালের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা। তা মিথ্যা হতে পারে? না।

জুলেখাকে কি এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা যায়? কামাল ভেবে দেখলো, এখন উচিত হবে না। আব্বা-আম্মা চলে যাক আগে। এখন কয়েকটা দিন সবদিক সামলে অতি সূক্ষ্ম তারের উপর ব্যালান্স করে হাঁটতে হবে। ওমর আলীকে সে কিছুতেই চলে যেতে বলতে পারবে না। ওমর নির্দোষ, তার প্রতি আম্মা যদি হঠাৎ খারাপ ব্যবহার করেন, সেটা খুব অন্যায় হবে। সব সময় আম্মাকে চোখে চোখে রাখা দরকার। ওদের নিয়ে বাইরে বাইরে বেড়াতে হবে।

পর পর কয়েকটা দিন কামাল লক্ষ্য করলো জুলেখা যেন তার আম্মা-আব্বাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। ঠিক অযত্ন করে না, নানা রকম রান্না করে, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়িকে বাড়ির বড় বউয়ের যেমন বেশি বেশি খাতিরের ভাব দেখাবার কথা, তেমন কোনো ভাব নেই। কখনো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলে না, কাটা কাটা উত্তর দেয়।

অথচ ওমরের সঙ্গে কথা বলার সময় তার চোখমুখ ঝলমল করে ওঠে। গলা দিয়ে অন্তরঙ্গ সুর বেরিয়ে আসে। এটাই তার স্বাভাবিক ব্যবহার কিন্তু কামাল বোঝে যে, আম্মা এটা পছন্দ করবে না।

রাত্রে শুতে এসে কামাল হালকা সুরে বললো, এই শোনো, এখন কয়েকটা দিন তুমি ওমর সাহেবের বেড-রুমে দুধ খাওয়াতে যেও না।

জুলেখা রেগে গেলো। ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো, কেন, যাবো না কেন? আমার যদি ইচ্ছে হয় যাবো।

জুলি, এরকম কথা কেনো বলছো? আব্বা-আম্মার বয়েস হয়েছে, ওদের সামনে একটু সামলে সামলে চলতে হয়। ওরা তো বেশিদিন থাকবে না।

কী সামলে চলবো? আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?

না তা বলছি না। কিন্তু আমার আব্বা-আম্মা তোমার গুরুজন, তাঁদের কিছুটা সেবা-যত্ন তুমি করবে এটা সবাই আশা করে।

কী অযত্ন করেছি আমি? বাড়ির দাসীর মতন সব কাজই তো করছি। তোমার আম্মা তো এঁটো প্লেটটাও উঠান না!

আম্মা বেড়াতে এসে কি বাসন মাজবেন? উনি কোনদিন এসব করেন নাই!

আমাকে বিনা পয়সায় দাসী রেখেছো, আমাকেই সব করতে হবে তা জানি। করছিও তো!

এবার কামালের মেজাজ চড়ে গেল। কয়েকদিন ধরে মনের মধ্যে যে কথাটা চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলো, সেটা বেরিয়ে এলো হঠাৎ।

ঢাকাতে টাইগারের সঙ্গে তোমার কী হয়েছিলো?

কে ?

টাইগার! তাকে চেনো না এমন ভাবভঙ্গি দেখাচ্ছো? আমাদের কয়েকখানা বাড়ির পরে থাকে। আমার এক দিদির ছেলে। তার কথা তুমি কিছু বলো নাই কেন?

বলার মতন কিছু তো ছিল না।

প্রথম প্রথম এসে তুমি আমাদের ঢাকার বাড়ির সকলের সম্পর্কে গল্প করতে।

সে তো তোমাদের বাড়ির কেউ না।

কিন্তু সে যখন তখন আসে। তোমার সঙ্গে তার ভাব ভালোবাসা হয়েছিল, সে কথা তুমি আমার কাছে গোপন করেছো। আমাদের দু'জনের ঠিক হয়েছিল না যে, আমরা দু'জনের সব কথা পরস্পরকে বলবো!

বলার কিছু নেই যেখানে তাও বলতে হবে? তোমার মন যে এত ছোট তা তো জানতাম না। তুমি আমাকে সন্দেহ করছো এভাবে!

তুমি এখানে এসেই টাইগারকে চিঠি লেখো নাই ?

না।

আম্মা বললেন।

মিথ্যে কথা!

শোনো জুলি, আমি আমার আম্মাকে তো ভালো রকম চিনি। তিনি তোমাদের মেলামেশা হয়তো অপছন্দ করতে পারেন, সেজন্য খারাপ কিছু ভাবতেও পারেন, কিন্তু তিনি বানিয়ে কিছু বলবেন না। চিঠি লেখার কথাটা তিনি মিথ্যে বলবেন কেন?

তোমার আম্মা কী ভেবে কী বললেন তা তিনিই জানেন, আমি ওসব কিছু জানি না!

কামাল এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। জুলেখার একটা হাত ধরে গাঢ় স্বরে বললো, জুলি, তুমি এরকমভাবে কথা বলছো কেন আমার সঙ্গে?

জুলেখা দাঁতে দাঁত চেপে বললো, এবারে আমাকে মারবে তো! মারো। তুমি যখন এত নিচে নেমেছো, এখন সব কিছু করতে পারো?

কামাল স্তম্ভিত হয়ে গেলো। জুলেখা তার সম্পর্কে এমন কথাও ভাবতে পারে? এই জুলেখা যার জন্য তার বুকের মধ্যে চাপ বেঁধে আছে ভালোবাসার। যে ভালোবাসা একটা জীবন্ত জিনিসের মতন বুকের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। জুলেখা তাকে এমন কঠিন কথা বলতে পারলো? সে জুলেখার গায়ে হাত তুলবে?

কামালের গলায় বাষ্প জমে গেল। সে কথা বলতে পারছে না। একটুক্ষণ থেমে থেকে সে মুখ নিচু করে বললো, না, আমি তোমার গায়ে-হাত তুলবো না। তোমাকে কিছুই বলবো না। যতদিন তুমি সত্যি কথা না বলবে, ততদিন তোমার সঙ্গে আমার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে না। তোমার যা দরকার হবে, চাইবে।

বিছানার মাঝখানে একটা বালিশ রাখলো কামাল যাতে জুলেখার সঙ্গে তার শরীরের স্পর্শ না লাগে। তারপর সে উল্টোদিকে ফিরে শুয়ে পড়লো। তার চোখ দিয়ে যে জল গড়াচ্ছে তা জুলেখাকে দেখতে দিতে চায় না।

এইরকমভাবেই চললো কয়েকদিন।

সারাদিন শুকনো, কাজের কথাবার্তা হয়। তারপর রাত্তিরে এক বিছানায় দু'জন অচেনা মানুষের মতন দু'পাশ ফিরে শুয়ে থাকে।

কামাল অবশ্য মনে মনে মুষড়ে আছে। জুলিকে বাদ দিয়ে তার জগতের আর কিছুই থাকতে পারে না। জুলিকে সে কি করে দূরে সরিয়ে রাখবে? এত কাছে জুলি, তবু তাকে সে স্পর্শ করতে পারে না। শরীর স্পর্শ করার আগে তার মনটা ভালো মতন বুঝে দেখা দরকার।

দূরত্ব ঘোচাবার চেষ্টা করেও কামাল পারে না।

এক একদিন সে জুলেখার মান ভাঙাবার চেষ্টা করে। ফিস ফিস করে দু' তিনবার ডাকে, জুলি জুলি!

কোনো উত্তর নেই।

জুলি, সত্যি কথা বললে আমি কিছুই মনে করবো না। টাইগারের সঙ্গে যদি তোমার ভাবও হয়ে থাকে তাতেও কিছু আসে যায় না। আমি শুধু চেয়েছিলাম তুমি আমাকে সব খুলে বলবে। আমাদের মধ্যে সেই রকমই কথা ছিল না?

কোনো উত্তর নেই।

তুমি এখানে এসেও টাইগারকে চিঠি লেখো নাই?

কোনো উত্তর নেই।

জুলি, তুমি তো জানো, আমি তোমায় কত ভালোবাসি। তুমি, কেন তুমি এত কষ্ট দাও আমাকে?

কোনো উত্তর নেই।

৬

এদেশে শরৎকালে অনেক গাছের পাতা লাল হয়ে আসে। তখন এখানকার প্রকৃতি একেবারে ঝলমল করে। তারপর আসে পাতা ঝরার দিন। শরৎকালের বিকেলও সুদীর্ঘ, আকাশের আলো নিভতে নিভতে ঘড়ির কাঁটায় নটা-দশটা বেজে যায়।

শরতের বিকেলে কেউ ঘরে বসে থাকে না।

শনিবার কামাল সবাইকে নিয়ে বেড়াতে এলো পার্কে। অতি বিশাল উদ্যান, সেখানে নানা রকমের গাছ, এক দিকে একটা প্রকাণ্ড ঝিল। তাতে রাজহংস-হংসী আসে। চতুর্দিক নানা রকম যুবক-যুবতীতে একেবারে ছয়লাপ।

কামালের বাবা মায়ের সঙ্গে জুলেখাও এসেছে। ওমরকেও বলা হয়েছিল, সে আসে নি। সিরাজুল আর বেবীকে আনা হয়েছে সঙ্গে, ওরা হুটোপুটি করছে, কামালও মেতে উঠেছে ওদের সঙ্গে।

সন্ধে যখন হয় হয়, নামাজের সময় হয়ে এসেছে, কামালের বাবা একটা নির্জন জায়গা দেখে নামাজ পড়তে বসলেন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, জুলেখা কোথায়?

তাই তো, জুলেখাকে তো কিছুক্ষণ ধরে দেখা যাচ্ছে না? কোথায় গেলো সে? কামাল বললো, আমি দেখে আসছি।

বেশ ভিড় আজ, এর মধ্যে কারুকে খুঁজে বের করা শক্ত। শাড়ি পরা কোনো মেয়ে দেখে সেদিকে কামাল ছুটে গিয়েও নিরাশ হয়। এখানে ভারতীয়-পাকিস্তানী-বাংলাদেশী মিলিয়ে শাড়ি পড়া মহিলার সংখ্যা কম নয়।

জুলেখা কি হঠাৎ ভিড়ের ধাক্কায় অন্যদিকে চলে গেছে, না ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছে? কামাল লক্ষ্য করছিলো, সে বেড়াতে এসেও কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। মা প্রায় রোজই পুত্রবধূর নামে নানারকম নালিশ করছেন। কামালের আর এসব সহ্য হয় না। এখন এক এক সময় তার মনে হচ্ছে, মা-বাবা চলে গেলেই বাঁচি।

প্রায় মিনিট দশেক খোঁজাখুঁজির পর সে দেখলো এক জায়গায় একটা দোলনায় একা বসে আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছে জুলেখা। গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অপরূপ দেখাচ্ছে তাকে, যেন সে এই পৃথিবীর কেউ নয়।

তার চোখ দু'টি শূন্যের দিকে, সে এখানে বসে থাকলেও তার মনটা এখন অনেক দূরে। আস্তে আস্তে আপন মনে কী যেন বলছে সে।

একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সে দেখলো জুলেখাকে। নাহ্ সে আজেবাজে সব কথা ভুলে যাবে। জুলেখা তার নিজের, জুলেখাকে সে কিছুতেই দুঃখ দিতে পারবে না। জুলেখা একদিন বলেছিল না, যে খুব বেশি আপন তাকেই হারাবার ভয়।

দোলনায় বসে দুলছে জুলেখা, কামালের দিকে তার নজর পড়লো না। কোন্ গভীর ভাবনায় সে মগ্ন?

কামালের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এত সুন্দর, কিন্তু এত সুদূর?

কাছে এসে কামাল খুব আস্তে করে ডাকলো, জুলি!

দু'তিনবার ডাকের পর জুলেখা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। সে দৃষ্টির মধ্যে কোনো আগ্রহ নেই।

তুমি এখনো বসে আছো?

আমার এখানেই ভালো লাগছে।

আব্বা-আম্মা তোমার খোঁজ করছিলেন। ওরা ভাবলেন তুমি বুঝি হারিয়ে গেছো।

কোথায় আর হারিয়ে যাবো!

শোনো জুলি, আব্বা-আম্মা তো আর বেশি দিন থাকবে না। তুমি আর এই কয়েকটা দিন ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারো না?

আমি বে-মানান কিছু করেছি?

আচ্ছা থাক, তোমাকে ও কথা বলবো না। তুমি যেমন আছো তেমনই থাকো। জুলি, তোমার পাশে একটু বসবো?

জুলেখা সঙ্গে সঙ্গে দোলনা থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করলো।

কামালের বুকটা মুচড়ে উঠলো দারুণভাবে। এখানে প্রথম আসার পর জুলেখা আর সে একসঙ্গে এসেছিলো পার্কে। এই রকমই একটা দোলনায় বসেছিলো। এখনো যেন ভেসে আসছে জুলেখার হাসির শব্দ।

সেদিন রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর কামাল ওমর আলীকে ডেকে নিয়ে গেলো বসবার ঘরে। তারপর মিনতিপূর্ণ গলায় বললো, ওমর সাহেব, আপনি আমার একটা উপকার করবেন? আপনি জুলেখাকে একটু বুঝিয়ে বলুন না। আমার আব্বা-আম্মা যে ক'দিন রয়েছেন, সেই ক'টা দিন ওদের একটু মন জুগিয়ে চলতে। ওদের বয়েস হয়েছে তো, শুধু শুধু মনে একটা দুঃখ নিয়ে ফিরে যাবেন, অথচ জুলেখা এত ভালো মেয়ে।

ওমর হকচকিয়ে গিয়ে বললো, একথা আমায় বলছেন কেন? আপনি নিজেই তো বলতে পারেন।

কামাল দুর্বলভাবে বললো, আমার কথা সে শুনতে চাইছে না। কী যেন হয়েছে তার। আপনার সঙ্গে তার খুব ভাব, সে আপনার কথা মানবে।

আপনি তার স্বামী, আপনার কথা না শুনলে উনি আমার কথা শুনবেন কেন। তা ছাড়া, আমি তো দেখি যে ভাবী ওদের যথেষ্ট যত্ন করেন। যতখানি সেবা করার...

হ্যাঁ, সেবা করছে ঠিকই। কিন্তু নিষ্প্রাণভাবে। যেন নিছক একটা কর্তব্য। ভালোভাবে কথা বলে না।

কী জানি, আমি তো তা বুঝি না।

আপনি একটু বুঝিয়ে বলে—

আশ্চর্য কথা বলছেন, কামাল সাহেব। এর মধ্যে আমার ভূমিকা কোথায় তা বুঝতে পারছি না, আমি একজন বাইরের লোক।

আপনি আমাদের পরিবারেরই একজন। আম্মাকে বলেছি, আপনার মতন মানুষ হয় না। আপনি আমাদের ছোট ভাইয়ের মতন।

আমি ভাবীকে এই সব কথা বললে তিনি রাগ করবেন না? এটা গায়েপড়া উপদেশের মতন শোনাবে।

না, না, সে আপনার কোনো কথায় রাগ করবেন না। সে আপনাকে খুব পছন্দ করে।

কামাল বারবার এই একই কথা বলে যেতে লাগলো। ওমর পড়াশুনোর অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়তে চায়। কিন্তু কামাল তাকে ছাড়বে না, ওমরের সঙ্গে কথা বলাটা যেন তাকে নেশার মতন পেয়ে বসেছে। বারবার সে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, আচ্ছা ওমর সাহেব, আপনি তো এত কাছ থেকে দেখেছেন, আমি কি জুলির উপর কোন অন্যায় করেছি। ওর কোন ইচ্ছায় বাধা দিয়েছি?

ওমর সাবধান মানুষ। স্পষ্ট কোনো মতামত দেয় না। কায়দা করে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে যায়।

দু'একবার জুলেখা এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। ভেতরে ঢুকলো না। সে এ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করছে না।

অনেক রাত্তিরে ওমর প্রায় জোর করেই চলে গেলো। কামাল এলো নিজের শোওয়ার ঘরে।

জুলি এক পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মাঝখানে বালিশ। ঘুমিয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

কামালের ইচ্ছে হলো জুলিকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চায়। এই রকমভাবে রাতের পর রাত কাটানো সে আর সহ্য করতে পারছে না। জুলিকে সে বলবে, আমি পুরানো সব কথা ভুলে যাচ্ছি। আব্বা-আম্মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ক্যানাডায়। এসো আমরা ঠিক আগের মতন আনন্দে থাকি।

কিন্তু সে জুলেখাকে স্পর্শ করতে পারলো না। সে প্রতিজ্ঞা করেছে জুলেখা সত্যি কথা না বললে সে আর তাকে ছোঁবে না। তাদের পরস্পরের সত্য ভাগাভাগি করে নেওয়ার শর্ত আছে। কামাল তো কোনদিন কিছু লুকোয়নি। বাড়ির বাইরে যখন যা ঘটেছে সব এসে বলেছে জুলেখাকে।

কোমল গলায় ডাকলো, জুলি! জুলি!

কোনো উত্তর নেই।

কামাল আবার বললো, জুলি, আমার যা দোষ হয়েছে, সব কিছুর জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। এবারে তুমি কিছু বলো।

জুলি তবু কোন সাড়া দিলো না। হয়তো সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কামাল শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। কিছুতেই তার ঘুম আসে না। কোনোদিন তার ঘুমের কোনো সমস্যা ছিল না। এখন এই কয়েকদিন ঘুম তার চোখ ছেড়ে গেছে।

কামাল ঘুমিয়ে পড়লো শেষ রাত্তির দিকে। গভীর ঘুম। তারপরেই একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটলো।

সকালবেলা সবাই জেগে উঠেছে, কামালই তখন ঘুমিয়ে। জুলেখা নাস্তা বানাচ্ছে রান্নাঘরে এসে। কামালের বাবা নামাজ পড়তে বসেছেন, মা ডাইনিং টেবিলটা পরিষ্কার করছেন, ওমর এক কাপ কফি নিয়ে বাইরে গেলো চিঠির বাক্স দেখতে।

জুলেখা রান্নাঘর থেকে এক একটা জিনিস এনে রাখছে ডাইনিং টেবিলে। তার দিকে তাকিয়ে মায়ের খটকা লাগলো। কী রকম যেন দুলে দুলে হাঁটছে জুলেখা। তার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়!

মা জিজ্ঞেস করলো, বউমা, তোমার কী হয়েছে, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

জুলেখা দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে জানালো, না।

কিন্তু তার পরই প্লেটে করে টেস্ট আনতে গিয়ে কয়েকখানা পড়ে গেল মাটিতে। জুলেখা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে যেন কী হয়েছে সে বুঝতে পারছে না।

ও বৌমা, কী হয়েছে তোমার?

কোনো উত্তর দিলো না জুলেখা। কোনো ক্রমে প্লেটটা টেবিলে রেখে সে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

মা ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ওমা কী হলো? ও কামাল, শিগগির আয়, দ্যাখ বউ কী রকম ক্লানি করছে! বউমা ও বউমা! কী হয়েছে তোমার!

প্রথমে ছুটে এলো ওমর। কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে সে বললো, ভাবী, ভাবী, কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ হয়েছে?

জুলেখা মাথাটা তুললো। সম্পূর্ণ ঘোলাটে তার চোখ। জড়ানো গলায় ফিসফিস করে বললো, আমি বিষ খেয়েছি। অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট একসাথে খেয়েছি।

তারপরই সে গড়িয়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

জুলেখা মরে যাচ্ছে, কামাল তখনও ঘুমোচ্ছে। দু'তিনজন মিলে ধাক্কাধাক্কি করে তুলে আনলো তাকে। জুলেখাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেও সে কোন কথা বলতে পারছে না। তার মাথা ঝিম ঝিম করছে। চোখ অন্ধকার, সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। জুলেখা নেই তা হলে, তারই বা বেঁচে থেকে কী লাভ?

মা বললেন, ও কামাল, তুই কথা বলছিস না কেন? বউমার এমন হলো কেন? কিছু একটা কর্।

কামাল তবু কথা বলতে পারছে না? কিছু একটা করতে হবে? কী? পুলিশে খবর দিতে হবে? ডাক্তার? জুলেখা যদি চলে যায়, তাহলে সে আর কিছুই করবে না। আগে নিজেকে শেষ করে দেবে!

ওমর ধমক দিয়ে বললো, কামাল সাহেব, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন! শিগগির ভাবীর মাথার দিকটা ধরুন। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

গাড়ির মধ্যে কামাল জুলেখাকে কোলে নিয়ে বসে রইলো। দুর্দান্ত স্পীডে গাড়ি চালিয়ে পৌছে গেলো হাসপাতালে।

এমারজেন্সি ওয়ার্ডে পৌছবার পর জুলেখা আর একবার চোখ মেললো খুব কষ্ট করে, তখনো তার জ্ঞান একেবারে চলে যায় নি।

ডাক্তার তার গালে চাপড় মারতে মারতে জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট হ্যাপনড? ইয়াং লেডি, তুমি কী খেয়েছো? কেন খেয়েছো?

জুলেখা গভীর বিষাদের সুরে বললো, মাই হাজব্যাণ্ড ডাজ নট নীড মি এনি মোর। আই ওয়ান্ট টু ডাই!

তারপরই সে জ্ঞান হারালো একেবারে। ●

জুলেখাকে ভেতরে নিয়ে যাবার পর কামাল আর ওমর এসে অপেক্ষা করতে লাগলো বাইরের পোর্টিকোতে। কামাল মুখ ধোয় নি। বাইরের পোশাক পরারও সময় পায় নি। এখনও যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

হঠাৎ ওমর হিংস্রভাবে বললো, কামাল ভাই, ভাবীর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি আপনাকে মাসাকার করে দেবো!

কামাল চমকে গেলো। ওমরের এরকম কণ্ঠস্বর সে কখনো শোনে নি। ওমর তীব্রভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ওমর তার ভাবীকে খুব ভালোবাসে, সে কামালের মতনই বিচলিত হয়েছে।

কামাল বললো, আপনি আমাকে বকছেন, আমি কি দোষ করেছি?

ওমর বললো, আপনিই তো দায়ী! আপনি ভাবীকে মেন্টালি টর্চার করেছেন। দিনের পর দিন আপনি তার সঙ্গে স্বামীর মতন ব্যবহার করেন নি। আপনার মায়ের কথা শুনে আপনি তাকে অযথা সন্দেহ করেছেন।

কামাল কান্না-জড়ানো গলায় বললো, জুলেখা কি বাঁচবে না? তাহলে আমি কী করবো?

ওমর বললো, একটা কথা শুনে রাখুন। ভাবীর যদি কোনো বিপদ হয়, আমি যদি তখন হাজার মাইল দূরেও থাকি, তাহলেও ছুটে আসবো। আপনাকে আমি তখন ছাড়বো না।

আপনি আমাকেই শুধু দায়ী করছেন।

হ্যাঁ।

কামাল দু'হাতে মুখ চাপা দিলো।

জুলেখা দু'দিন বাদেই ছাড়া পেয়ে গেল হাসপাতাল থেকে। তারপর সে সোজা চলে গেলো মন্ট্রিয়েলে মায়ের কাছে শরীর সারাবার জন্য।

জুলেখার মা কামালকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করলেন। মেয়েটার শরীর ভেঙ্গে গেছে। কামালই তার ওপর অত্যাচার করে করে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। আর একটু হলে তো মেয়েটা মরেই যেতো। বেঁচে উঠলেও তার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে। কামালের বাবা-মাই বা কী রকম মানুষ? তাঁদের না হয় টাকা পয়সা আছে, তাই বলে কি তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন?

সকলেই কামালের দোষ দিতে লাগলেন।

জুলেখার শরীর সেরে উঠলো কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু সে আর বস্টনে ফিরে আসতে চায় না। তার চরিত্রের দারুণ পরিবর্তন হয়েছে। আগে সে ছিল নরম স্বভাবের, মিষ্টি গলায় কথা বলতো। এখন সে হয়ে উঠেছে উগ্র। তার কথাবার্তা ঝাঁঝালো।

কামাল নিয়মিত বোস্টন থেকে মন্ট্রিয়েলে যাতায়াত করে। কিন্তু জুলেখা তার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। সামনাসামনি পড়ে গেলে কটু কথা বলে।

কামাল খুব কাতর গলায় অনুরোধ করে, জুলি, তুমি শুধু একবার ফিরে চলো। তুমি যা চাও তাই হবে। লোকে ভুল ভাবছে। আমার আম্মা-আব্বা বেড়াতে চলে গেছেন, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

জুলেখা বললো, না, এখন আমি কিছুতেই যাবো না। আমি এখানে পড়াশুনো করবো। কলেজে ভর্তি হবো। তুমি আমাকে টাকা পাঠাবে। আমার জামাকাপড়, আমার উইন্টার ক্লোদস এখানে পৌঁছে দেবে।

তুমি পড়াশুনো করবে, বেশ তো বস্টনেই পড়বে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

বাজে কথা! আমি আগে অনেকবার বলেছি, তুমি কিছুই করো নি।

আগে আমার টাকা-পয়সার অসুবিধা ছিল, তুমি তো সব জানো। এখন সে অসুবিধা নেই।

ওসব আমি শুনতে চাই না। তুমি টাকা না দাও, আমি চাকরি করবো, সেই সঙ্গে পড়বো। তুমি আমার জামাকাপড় সব এনে দাও।

তুমি চলো, তুমি নিজেই বেছে আনবে তোমার কী কী জামাকাপড় দরকার।

আমার যাবার তো দরকার নেই। আমার শাড়িগুলো কোথায় আছে তুমি সব জানো। ওয়ার্ড রোবে আমার কোট, রেইন কোট আছে, সবকিছু নিয়ে আসবে।

তবু তুমি একবার যেতে পারো না? একটা উইক এণ্ডের জন্য? বাসে বা গাড়িতে যেতে হবে না, আমি তোমাকে প্লেনে করে নিয়ে যাবো, আবার নিয়ে আসবো।

তোমাকে কতবার বলেছি, আমি এখন যাবো না। তোমার সঙ্গে বেশি কথা বলতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। তুমি আমার জামাকাপড় দিয়ে যাবে কি না বলো।

কামাল অসহায়ের মতন জুলেখার মায়ের কাছে সাহায্য চায়। তিনি বলেন, আমি কি করবো, বলো। তোমাদের নিজেদের ব্যাপার। মেয়ে বিয়ে দিয়েছি, এখন তার ভালমন্দ সে বুঝবে। সে যদি যেতে না চায়, জোর করে কি আমি পাঠাতে পারি? তুমি অন্যায় করেছো, তার ফল তো তোমাকে ভুগতে হবে।

আমি কী অন্যায় করেছি?

সে সব কথা পরে হবে। অনেক বেলা হলো, তুমি কি এখানে খেয়ে যাবে?

না। ওকে যদি এখানে খেতে দাও, তাহলে আমি কিছু খাবো না। ও যদি থাকে এখানে তা হলে আমি এ বাড়ি থেকেও চলে যাবো।

তারপর হিস্টিরিয়া রুগীর মতন সে চেঁচাতে লাগলো। ওকে চলে যেতে বলো। ওকে চলে যেতে বলো।

৭

জুলেখার হিস্টিরিয়া বেড়েই যেতে লাগলো। অন্য সময় সে ঠিক থাকে। অন্যদের সঙ্গে সে ভালো ব্যবহার করে, শুধু কামালের নাম শুনলেই সে ক্ষেপে যায়। কামাল টেলিফোন করলে সে সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখে। কামাল তাদের বাড়িতে এলে পারতপক্ষে সে তার সঙ্গে দেখাই করতে চায় না, কিংবা দেখলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

কামালের মনে হলো, জুলেখার চিকিৎসা করানো দরকার। তার একটা মানসিক বিপর্যয় তো ঘটেছে ঠিকই। এ দেশে এরকম অবস্থায় সবাই সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে ধরনা দেয়।

কামাল জুলেখার মাকে খুব করে ধরে বসলো, জুলেখাকে একদিন মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি জুলেখার সঙ্গে কথা বলে জানালেন যে, কামাল যদি ফি'র টাকা দেয়, তাহলে জুলেখা যেতে রাজি আছে। কিন্তু সে আলাদা যাবে। কামাল আলাদা যাবে।

তাই হলো, প্রথমে সে পাঠালো জুলেখাকে। তারপর অন্যদিন সে নিজে গেলো।

ডাক্তারটি যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন কামালের ওপর। তার স্ত্রীর অনেক রকম সমস্যা। মনের ওপর দারুণ চাপ পড়েছে। আবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে। এ জন্য দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা দরকার, অন্তত এক বছর টানা সিটিং দিয়ে যেতে হবে।

ডাক্তারটি দয়াপরবশ হয়ে জানালেন যে, এই চিকিৎসায় প্রচুর খরচ। তবে যেহেতু তিনি ওরিয়েন্টাল রোগী আগে পান নি এবং প্রাচ্যের লোকদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে, সেই জন্য তিনি মাত্র সাড়ে তিন হাজার ডলারে এই চিকিৎসা সম্পন্ন করতে পারেন।

কামাল এই টাকাও যোগাড় করতে রাজি ছিল কিন্তু পরিচিতরা সবাই তাকে ভিন্ন পরামর্শ দিলো। কেউ কেউ তাকে বোকা বলে ঠাট্টা করলো। এসব হলো বড় লোকদের ঘোড়া রোগ। আমাদের দেশের কেউ এইরকম ব্যাপারে ডাক্তারদের কাছে যায়? স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া, কিছুদিন সময় কেটে গেলে আপনিই সব মিটে যায়! কামাল একটু কড়া হতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কড়া হওয়া যে কামালের ধাতে নেই।

জুলেখার মা-ও বললেন, ঐ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কামাল কিছুদিন দূরে দূরে থাকুক বরং। মেয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা হোক আগে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেরিয়ে মাসের পর মাস কেটে যায়। জুলেখা দিন দিন আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সে মন্ট্রিয়েলে পড়াশুনা শুরু করেছে, বস্টনে আসবে না।

কামালের বাবা-মা বেড়াতে গেছেন অন্য জায়গায়। বাড়িতে এখন শুধু সে আর ওমর। কিন্তু ওমরের সঙ্গে তার দেখা হয় খুব কম। কামাল যখন বাড়িতে আসে তখন ওমর থাকে না।

বস্টনের পরিচিত মহলে রটে গেছে যে কামালের স্ত্রী রাগ করে চলে গেছে। কামাল তার স্ত্রীকে সামলাতে পারে নি। তার বউ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো কেন? নিশ্চয়ই ভেতরে কিছু গণ্ডগোল আছে।

আড়ালে অনেকের কাছে কামাল হাসাহাসির পাত্র হয়ে ওঠে।

যারা খুব অন্তরঙ্গ তাদের কাছে ব্যাকুলভাবে আশ্রয় খোঁজে।

মীনা বৌদি, মিতা, ওমর এরা কি জুলেখাকে বোঝাতে পারে না? এদের কথা তো জুলেখা মানে!

মীনা বৌদি একদিন খুব বকে দিলেন কামালকে।

কামাল, তোমাকে আমি সেই প্রথমেই একদিন বলেছিলাম না, বাড়িতে অন্য লোক নিয়ে যেও না, তাতে বিপদ হবে?

কিন্তু ভাবী, ওমর সাহেব তো কোনো বিপদ ঘটান নি। তিনি বরাবর আমাদের সাহায্য করেছেন। জুলেখা যেদিন আত্মহত্যার চেষ্টায় ট্যাবলেট খেলো, সেদিন উনিই বলতে গেলে জুলেখাকে বাঁচিয়েছেন। উনি সেই সময় পাশে না থাকলে, সব ব্যবস্থা না করলে আমি কী যে করতাম, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো।

WWW.BANGLABOOK.COM

ঐ আত্মহত্যার ঘটনাটা আমি বিশ্বাস করি না। শোনো, তোমাকে আগে বলিনি জুলেখাকে গোড়া থেকে আমারই তেমন পছন্দ হয় নি। কেমন যেন চণ্ডী চণ্ডী ভাব! রূপের কি দেমাক! অন্য পুরুষদের দিকে প্যাট প্যাট করে চায়। ওকে তুমি ভুলে যাও।

না ভাবী। এটা আপনি ঠিক বললেন না। জুলেখাকে আপনি ভুল বুঝেছেন। ও ভালো মেয়ে। সত্যি ভালো মেয়ে। ওকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ও নাকি তোমাকে ওদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

সেটাও রাগের মাথায়।

কামাল, তোমার বুঝি রাগ নাই?

আমি রাগ করলে তো লাভ কিছু হবে না। সমস্ত ব্যাপারটাই তো ভুল বোঝাবুঝি। জুলেখা আমাকে ভালোবাসে। আমি তাকে ভালোবাসি। মাঝখানে একটা কমুনিকেশান গ্যাপ হয়ে গেছে। সেইজন্যই তো আপনাকে বলছি, আপনি যদি জুলেখাকে একটু বুঝিয়ে বলেন।

আমাকে ও দায়িত্ব দিও না। আমার কথা সে শুনবে কেন? তোমাকে যখন আমি বলেছিলাম, ওমরকে বাড়িতে রেখো না তখন তুমি শুনেছিলে আমার কথা?

আমি তো ওমর সাহেবের কোনো দোষ দেখি নাই। সে ভালো ছাত্র, পড়াশুনোর দিকে বেশি মন, তা ছাড়া বিবাহিত, তাকে প্রথম থেকেই কেন অবিশ্বাস করবে লোকে?

আহা-হা! কী কথাই বললে! ভালো ছাত্র হলে বুঝি একেবারে মাথা কিনে নেয়া? বিবাহিত লোকেরা বুঝি ব্যভিচারী হয় না? কতই তো দ্যাখলাম। কামাল, তোমার মনটা সাদা তা জানতাম, কিন্তু তুমি যে অন্ধ তা জানতাম না।

আমি কোনো মানুষকেই অবিশ্বাস করতে পারি না। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা কি দোষের!

তোমায় কে বলেছে যে ওমর বিবাহিত? সে নিজের মুখে কোনোদিন বলেছে?

না, তা বলে নাই। প্রথম পরিচয়ের দিনে মাহমুদ বা বিশ্বজিৎ কে যেন বলেছিল। সেই থেকেই আমার কেমন যেন ধারণা হয়ে গেছিল। ওমর অবশ্য এতদিন একবারও বাড়ির কথা কিছুই উল্লেখ করে নাই, মাঝে মাঝে আমার খটকা লাগতো। আমি ভাবতাম, উনি কম কথা বলেন, প্রাইভেট বিষয়ে আলোচনা করতে চান না।

কামাল, তুমি আশ্চর্য! তুমি আশ্চর্য!

বিবাহিত না হলেই বা কী হয়! জুলেখাকে সে ভাবী হিসেবে শ্রদ্ধা করে!

এবারে সে জুলেখাকেই বিয়ে করবে। এটাই ছিল তার প্ল্যান....

এটা আপনি কি বলছেন ভাবী? জুলেখা আমার স্ত্রী!

কামাল, আমাকে রান্না করতে হবে। এখন আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। আমাকে জড়িয়ো না। ফোন ছাড়ছি, খোদা হাফেজ!

মিতার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই, তাকে খুঁজে বার করলো কামাল। তারপর বললো, মিতা, তোমাকে আমি ভাড়ার টাকা দিচ্ছি। তুমি মন্ট্রিয়েলে চলে যাও, তুমি জুলেখাকে বোঝাও। সে কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে?

মিতা বললো, কামাল ভাই, আমি গেলে কিছু লাভ হবে না।

কেন? সে তোমার প্রাণের বন্ধু। সে তোমার কথা শুনবে না? আমি তো তার সঙ্গে কমুউনিকেট করতে পারছি না। জুলির মা-ও বোধহয় বাধা দিচ্ছেন, তিনিও মেয়েকে পাঠাতে চান না কিন্তু আমি জানি রাগ পড়ে গেলেই জুলির মন কাঁদবে এখানে আসার জন্য। তুমি তাকে আমার কথাগুলো তোমার মুখ দিয়ে জানাও। তুমি বলো, সে যেন আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে। আমি পুরোনো কথা কিছু মনে রাখবো না। আমি তার জন্য বুক পেতে বসে আছি!

কামাল ভাই, আমি তার সঙ্গে দু'বার টেলিফোনে কথা বলেছি। অনেকক্ষণ। আমার পয়সা বেরিয়ে গেছে।

সে টেলিফোনের বিল আমি দিয়ে দেবো।

সে কথা হচ্ছে না। তাহলেই বুঝছেন, আমি তার সঙ্গে অনেক কথাই বলেছি। তার মধ্যে বারবার জিজ্ঞেস করেছি, তুই বস্টনে আসছিস না কেন? কবে আসবি। উত্তরে সে বলেছে, তুই আর যা কিছু বল, তুই শুধু ঐ বিষয়ে অনুরোধ করবি না। আমি বস্টন ফিরে যাবো না।

এটা কবেকার কথা?

এক সপ্তাহ আগে।

তখনো তার রাগ পড়ে নি। এখন কমে যেতে পারে! মিতা, তুমি আবার চেষ্টা করো। মন্ট্রিয়েল চলে যাও না।

এখন তো আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ফোন করবো।

মিতা, তুমি আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিলে কেন?

সত্যি কথা বলছি, কামাল ভাই, যেদিন থেকে ওমর সাহেব এলেন আপনাদের ওখানে, সেদিন থেকে আমার কী রকম ভয় করতো।

কিসের ভয়!

তা ঠিক জানি না। খালি মনে হতো একটা কিছু বিপদ হবে। জুলেখাও তো বেশি বার বলে নি আমাকে আপনাদের বাড়ি যেতে।

তোমাকে দু-তিনবার নেমন্তন্ন করেছে।

তা করেছে। কিন্তু আগে যেমন যখন তখন টেলিফোনে চলে আসতে বলতো—আমি ওমর সাহেবকে আগে থেকেই চিনতাম তো।

তুমি চিনতে? কোথায়!

ঢাকায়। আমার মনে হয়েছিলো ওমর সাহেব আপনাদের বাড়িতে আমাকে দেখলে পছন্দ করতেন না।

কেন? উনি তোমাকে অপছন্দ করবেন কেন?

সে আছে অনেক ব্যাপার! আচ্ছা উনি কি কয়েকদিনের মধ্যেই নিউইয়র্ক যাচ্ছেন? সে সম্পর্কে জানেন কিছু?

না তো। আজকাল দেখাই হয় না। উনি খুব নাকি ব্যস্ত কি নিয়ে। হঠাৎ তুমি একথা জিজ্ঞেস করলে কেন? উনি নিউইয়র্ক যাচ্ছেন কিনা তা তুমি কী করে জানলে?

শুনেছি। উনি আমার চাচাকে সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু সত্যি কি নিউইয়র্ক যাচ্ছেন? না মন্ট্রিয়েল যাবেন?

মন্ট্রিয়েল যাবেন? আমাকে না জানিয়ে?

আপনি আগেরবার যে ইন্ডিয়া গেলেন, জুলেখাকে মন্ট্রিয়েলে পাঠিয়ে দিলেন, তখন ওমর সাহেবও মন্ট্রিয়েল এসেছিলেন, আপনি জানেন?

না, জানি না তো! কেউ তো আমায় বলে নি!

উনি গিয়েছিলেন, আপনার শাশুড়ি নিজের বাড়িতে ওকে থাকতে দিয়েছিলেন। ওখানেই তো ওমর সাহেব ছিলেন তিন চার দিন।

তাই বুঝি? আমার আড়ালে অনেক কিছু ঘটে যায়, আমি জানতেও পারি না। যাই হোক, ওসব পুরোনো কথা থাক। তুমি জুলেখাকে ফিরিয়ে এনে দাও আমার কাছে।

কামালের মা একদিন ফোন করলেন টরেন্টো থেকে। তাঁর কণ্ঠস্বরে রাগ একেবারে ঝলসে উঠেছে।

হ্যাঁরে কামাল, তোকে নাকি তোর শাশুড়ি মন্ট্রিয়েলের বাড়ি থেকে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছে? কিছু খেতে পর্যন্ত দেয় নাই!

কে বললো তোমাকে, আম্মা?

সব কথা আমার কানে আসে। তাড়িয়ে দিয়েছিলো কিনা সত্যি করে বল্।

না, ঠিক সে রকম ব্যাপার নয়। জুলেখার মা কিছু বলেন নাই। জুলেখার হঠাৎ হিস্টিরিয়ার মতন হয়ে গেল, ওর মাথা ঠিক ছিল না।

ওসব হিস্টিরিয়া-মিস্টিরিয়ার কথা আমি শুনতে চাই না। ওর মাথা কোনো কালেই ঠিক ছিল না। ওর মা মেয়েকে কন্ট্রোল করতে পারে নাই? আমার ছেলেকে সে এমন অপমান হতে দিলো! শোনার পর থেকে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে।

শোনো আম্মা, তুমি এত বিচলিত হইয়ো না। সে সব কথা আমি গায়ে মাখি নাই।

তুই কী বলছিস, কামাল! আমি বিচলিত হবো না। আমাদের বাড়ির একটা সুনাম আছে না? সেই বাড়ির ছেলে হয়ে তুই এতটা সহ্য করছিস? এখনো তুই ওদের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে চাস?

শোনো, শোনো—

আগে তুই শোন্ আমার কথা। ওরা কি মানুষ? না পশু? ওদের চোখের চামড়াটুকু পর্যন্ত নাই। যারা নেমকহারাম তাদের আমি মানুষ বইল্যা গণ্য করি না। আজ বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ, ওরা পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতো। আমি ওদের মেয়েকে বাড়ির বউ করে এনেছি। তুই তোর শাশুড়ি আর শালাকে স্পনসারশীপ দিয়ে এদেশে এনেছিস। ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিস। তোর জন্যই তো ওদের সবকিছু। এখন এদেশে সেট্‌লড হয়ে গেছে বলে সে গরমে তোরেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়? নিমকহারাম আর কাকে বলে?

সবটাই ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। ওরা ভেবেছে—

তুই চুপ কর্। আমাকে কী বুঝাবি? তোকে আমি বলে দিচ্ছি, ও মেয়ের কথা মুখে আনিস না। আমি আরও ভালো মেয়ে দেখেশুনে তোর বিয়ে দেবো।

না আম্মা, সে প্রশ্ন ওঠে না। জুলেখাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাকে ভালোবাসি।

তুই কি এখনো পুরুষ হস্ নাই। এখনো সেই আল্লাভোলা বাচ্চাটাই আছিস? যে মেয়ে তোর চোখে ধুলা দিয়ে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দ্যায়—

তুমি টাইগারের সঙ্গে ওর যে সম্পর্কের কথা বলেছিলে, সেটা কি ঠিক? এখান থেকেও চিঠি লিখেছিল?

একখানা না, দু'খানা। টাইগারকে একদিন আমি বকতে গিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে চাঁটগায় দেখা হইলো, আমার বকুনি শুনে সে পকেট থেকে চিঠি দু'খানা বার করে দেখালো।

আম্মা, চিঠি তো এমনিতেও লিখতে পারে। কিন্তু ঐ সব কথা কি তোমার আমাকে বলা উচিত হয়েছে? তুমি মা হয়ে নিশ্চয়ই চাইবে যে তোমার ছেলে আর ছেলের বউ সুখে থাকুক।

তা চাই বলেই তোর বিয়ে দিলাম। বিয়ে দিয়ে তোকে ঘরে বাঁধতে চেয়েছিলাম। কত আশা করে এনেছিলাম ঐ বউ।

কিন্তু তুমি এখানে বসে ঐ পুরোনো কথা বলে আমার মনটা বিষিয়ে দিতে চেয়েছিলে।

সে কথা কইতাম না। যদি তুই ঘরে আর একটাকে এনে না ঢুকাতিস। ওকে দেখেই মনে হলো, ঢাকায় কোনোক্রমে মান সম্মান বাঁচিয়েছি, কিন্তু এখানে বুঝি সর্বনাশ হয়ে যায়।

ওমরকে তুমি মিথ্যে সন্দেহ করেছো। তোমার কথা শুনেই আমি জুলেখার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছি, সেইজন্যই সে সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

সুইসাইড না ছাই! কত না ঢং দেখলাম! তোর বউ কয়খানা টেবলেট খেয়েছিল তুই গুণে দেখেছিস? তিন চারটা ভেলিয়াম আমি নিজেই খেয়ে হজম করে ফেলতে পারি। জুলেখা মাত্তর নয়খানা ট্যাবলেট খেয়েছে। সে জানতো ওতে কিছুই হবে না। শুধু আমাদের ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা! ওটা একটা ঢং।

তুমি কি করে জানলে মোট নয়টা খেয়েছে?

আমার ওষুধের বাক্স থেকেই তা সরিয়েছে। আমি গুণে দেখি যে নয়টা কম পড়েছে। আর কোথা থেকে সে পাবে। তোর কাছে কি ঐ ওষুধ ছিল?

না, তা ছিল না, তবে অন্য কোনোভাবে যোগাড় করতে পারে?

কীভাবে যোগাড় করবে? সে কি একা একা কিনতে যাবে? গেলেও তাকে বেশি দেবে না!

ওমরের কাছ থেকে যোগাড় করতে পারে।

ওমর তাকে গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ দেবে? যদি দিয়ে থাকে তাহলে সেটা তো এক ষড়যন্ত্রকারী। মহা পাপী, শয়তান! ওসব কিছু না, আর কেউ দেয় নাই, মাত্র ঐ কটা খেয়েই আমাদের ধোঁকা লাগিয়ে দিতে চেয়েছে। তোর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার একটা ছুতো! ওর যদি বেশি কিছু ক্ষতি হতো, তাহলে মাত্তর দুইদিন পরই ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়?

আম্মা, তুমি জুলেখাকে একেবারেই পছন্দ করো না, তাই না?

আগে করতাম। পছন্দ করেই তো তাকে বউ করে এনেছিলাম। কিন্তু তার ব্যবহার দেখে আমি আর তাকে মেনে নিতে পারি না! ও মেয়ে চলে গেছে, আপদ বিদায় হয়েছে! ওকে তুই ভুলে যা।

না আম্মা, আমি জুলেখাকেই চাই। আমাদের সুন্দর জীবন ছিল, তা তুমি নষ্ট হতে দিও না।

তোকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, তবু তুই আবার যেতে চাস! তোর মান-সম্মান কিছু নাই?

আমি ওদের বুঝাবো।

হিন্দুরা যেমন গলায় গামছা দিয়ে গুরুর কাছে ক্ষমা চায়, তুই সেরকম করবি!

ক্ষমা চাইলে মানুষ কখনো ছোট হয় না। ক্ষমা চাওয়া আর ক্ষমা করতে পারা, এই দুটাই মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ।

তুই একটা দামড়া বলদ্ হয়েছিস। ছি ছি ছি। তোর যা ইচ্ছা তুই তাই কর্। আমি রাখছি। আমাকে আর তোর দরকার নাই যা বুঝছি। আল্লাহ্ তোকে দেখবেন! খোদা হাফেজ!

খোদা হাফেজ, আম্মা।

ওমরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কামাল পরদিন দুপুর থেকে বাড়িতে বসে রইলো। ওমর ফিরলো রাত প্রায় এগারোটার কাছাকাছি!

কামাল ডাইনিং টেবিলে বসে কাগজ ওল্টাচ্ছে। ওমর তার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলো, কামাল জিজ্ঞেস করলো, আপনি কিছু খাবেন না ওমর সাহেব? আমি স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে দিতে পারি। ভাতও আছে।

ওমর বললো, থ্যাঙ্ক ইউ, না আমি খাবো না! বাইরে খেয়ে এসেছি।

একটু বসেন না, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

আজ আমি খুব টায়ার্ড। কাল বললে হয় না? আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।

বেশি সময় লাগবে না। একটু বসেন। আপনি কি দুই একদিনের মধ্যে নিউইয়র্ক যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

শুধু নিউইয়র্ক যাবেন না অন্য কোথাও যাবেন?

কেন বলুন তো? আমি নিউইয়র্ক যাই বা অন্য কোথাও যাই তার জন্য কি আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

না, সেভাবে বলি নাই! ভাবছিলাম, আপনি নিউইয়র্কের নাম করে মন্ট্রিয়েলেও যেতে পারেন হয়তো। আমি যখন ইন্ডিয়ায় গিয়েছিলাম সেই সময় আপনি একবার মন্ট্রিয়েলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন জুলেখাও সেখানে ছিল।

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, তাতে কী হয়েছে।

সে কথা আপনি আমাকে বলেন নাই।

বলার মতন প্রসঙ্গ ওঠে নাই। আপনি জিজ্ঞেস করলে ঠিকই বলতাম। কেন, ভাবীও তো জানেন সে কথা, তিনি বলেন নাই আপনাকে?

না। আপনি মন্ট্রিয়েলে গিয়ে জুলেখার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন, ওদের বাড়িতে থেকে যেতে বলেছেন, আপনি সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়েছেন, এসব কথা কিছুই আমি আগে জানতাম না।

আমি মন্ট্রিয়েলে যাবার পর ভাবী কেমন আছেন তার খোঁজ করেছি। বাইরে গেলে সব মানুষই চেনা মানুষের খোঁজখবর নেয়। আপনি নেন না? ভাবীর মাকে আমি খালাম্মা বলি। খালাম্মা আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। তারপর জোর করে বললেন, তুমি হোটেলে কেন থাকবে, এ বাড়িতে থাকো। তাই আমি থেকেছি। সেটা কি অন্যায়?

না, না অন্যায় বলবো কেন? আপনার খালাম্মা আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন তাই আপনি গেছেন। শুধু আমাকে কেউ কিছু বলে নাই। এবারেও আপনি মন্ট্রিয়েলে যাচ্ছেন নাকি?

যদি ইচ্ছে হয় যাবো। কেন, আপনার আপত্তি আছে?

না, আপত্তি কেন থাকবে? আপনি গেলে আমার সুবিধাই হয়। আপনি আমায় সাহায্য করতে পারেন? আপনি ওখানে গিয়ে নিশ্চয়ই আপনার খালাম্মার সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলুন তিনি তাঁর মেয়েকে এখানে পাঠাচ্ছেন না কেন? জুলেখার সঙ্গেও আপনার দেখা হবে, তাকেও বলবেন।

আপনি নিজেই তো বারবার যাচ্ছেন সেখানে, অনেকবার বলেছেন, আমি বললে আর নতুন কী হবে?

আপনাকে ওরা পছন্দ করে, আপনার কথা ওরা মানে।

আপনার চেয়েও আমার কথা বেশি মানবে, তা আমি বিশ্বাস করি না। যাই হোক, ফর ইয়োর ইনফরমেশান, আমি এখন মন্ট্রিয়েলে যাচ্ছি না, আমি নিউ ইয়র্কেই যাচ্ছি।

ওঃ তাহলে তো অন্য কথা। অবশ্য যদি এর মধ্যে আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়।

না, আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয় না।

আচ্ছা ওমর সাহেব, আপনি জানেন, আপনাকে আমি ছোট ভাইয়ের মতন মনে করলেও আপনার কথা আমি মান্য করি। আপনি বলেন তো আমাদের যে শান্তির সংসার ছিল তা হঠাৎ করে এমন নষ্ট হয়ে গেল কেনো? জুলেখা কি মন্ট্রিয়েলে সুখে আছে? নিশ্চয়ই নেই। কোনো বিবাহিত মেয়ে নিজের সংসার ছেড়ে সুখে থাকতে পারে না। এদিকে আমিও কষ্ট পাচ্ছি। কেন এরকম হলো!

সেটা আপনি খুব ভালোই জানেন।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারিছ না।

আপনি সবই বুঝেন, এখন ইচ্ছে করে যদি বুঝতে না চান।

আপনি এই ভাবে কথা বলছেন আমার সঙ্গে? আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাইছি, আর আপনি আমাকে আঘাত দিচ্ছেন।

আপনি ইদানীং ভাবীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতেন। তার সঙ্গে আপনার সুস্থ সম্পর্ক ছিল না। ভাবী অনেক সহ্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে ভাবী আত্মঘাতিনী হতে গেলেন। সে জন্য আপনি দায়িত্ব এড়াতে পারবেন?

আপনি শুধু আমাকেই দায়ী করছেন! যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিনও আপনি এই কথাই বলেছিলেন, আজও বলছেন। আমি কি সত্যিই এরকম খারাপ লোক? আমার কিছু দোষ আছে জানি। আপনি আমাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, আমাকে আপনার এতটাই খারাপ মনে হয়?

না, আপনি খারাপ হবেন কেন? আপনি স্বর্গের ফেরেশতা। আপনি কত মানুষের উপকার করে বেড়ান, আপনি মহৎ, আপনি টাকা পয়সার হিসাব রাখেন না, লোকে এইসবই জানে। কিন্তু আপনার মন যে সন্দেহে ভরা তা লোকে জানে না। আপনি ভাবীর চরিত্র নিয়ে মিথ্যা সন্দেহ করেছেন, তার নামে অপবাদ দিয়েছেন।

মিথ্যা সন্দেহ, অপবাদ! আপনি টাইগারের সঙ্গে আপনার ভাবীর সম্পর্কের কথা কিছু শুনেছেন?

টাইগার, কে টাইগার?

ঢাকার একটি ছেলে। তার কথা আপনি কিছু শোনেন নি? জুলেখা তাকে চিঠি লিখতো, তবু তা জেনেও আমি জুলেখাকে সন্দেহ করিনি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, টাইগারের কথা সে আমাকে কিছু বলে নি কেন? এইটুকু জিজ্ঞেস করা অপরাধ?

শুধু এইটুকু না, আরও অনেক কিছু করেছেন নিশ্চয়ই। শুধু শুধু কেউ বিষ খেয়ে মরতে চায় না।

যদি বলি বিষ খাওয়ার ঘটনাটা একটা ফার্স? তাকে ঘুমের ট্যাবলেট কে দিয়েছিল? আপনি দিয়েছিলেন? আপনি দ্যান নাই। আমার মায়ের মেডিসিন বক্স থেকে সে মাত্র নয়টা ভ্যালিয়াম নিয়েছিল, তাতে বড়জোর টানা চব্বিশ ঘন্টা ঘুম হয়। ঐ ফার্সটা সে করেছিল এখান থেকে চলে যাবার জন্য যাতে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে না হয়।

WWW.BANGLABOOK.COM

ও, আপনি ভাবীকে এতটাই সন্দেহ করেন! তাহলে আপনার সঙ্গে আর এ বিষয়ে কথার প্রয়োজন নাই। অনেক রাত হয়েছে, আমি ঘুমুতে যাচ্ছি, গুড নাইট।

দাঁড়ান ওমর সাহেব, আর একটু কথা আছে। আপনি ধীর স্থির মানুষ, আপনি আমার চেয়ে বেশি বোঝেন। জুলেখাকে কি করে ফিরিয়ে আনা যায়, একটা বুদ্ধি দিন। সে যে চলে গেলো, সে ব্যাপারে আপনার নিশ্চয়ই কোনো ভূমিকা ছিল, তার ফিরে আসার ব্যাপারেও আপনার কোনো ভূমিকা থাকা দরকার।

আপনি এই কথা বলছেন? আপনার মনটাকে নগ্ন করে ফেললেন, আর চেপে রাখতে পারলেন না। জানতাম, আপনি আমার নামেও মিথ্যে অপবাদ দেবেন। আমি আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবার চেষ্টা করেছি, যেটুকু উপকার করা সম্ভব করেছি। তার বিনিময়ে আপনি আমাকে এই উপহার দিলেন! এর মধ্যে আপনি লোকের কাছে আমার নামে বলে বেড়াচ্ছেন।

না, শুনুন, শুনুন, ওমর সাহেব আমি তো কাউকে বলি নি!

হ্যাঁ, বলেছেন, আপনি বলেছেন, আপনার আম্মা বলেছেন। আপনারা আমার চরিত্র সম্পর্কে দুর্নাম ছড়াচ্ছেন। আপনার স্ত্রী চলে গেছে। এখন আপনি আপনার দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো, আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না আপনাদের সঙ্গে!

কামাল উঠে ওমরের হাত ধরতে গেল। ওমর এক ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো নিজের ঘরে।

কয়েকদিনের মধ্যে ওমর তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেলো অন্য অ্যাপার্টমেন্টে। কামাল একদম একা। তাকে নিয়ে চারদিকে ফিসফিস চলছে, কেউ তার বাড়িতে আসে না।

এই সময় নানা লোকেরা নানা রকম উপদেশ দিতে কার্পণ্য করে না। কেউ বললো, কামাল, তুমি ওকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দাও। দেখবে ঠিক সুড় সুড় করে ফিরে আসবে। সে তোমার সঙ্গে কথা বলে না অথচ টাকা তো ঠিক নেয়।

কেউ বললো, কামাল, তোমার একটু শক্ত হওয়া উচিত ছিল। মেয়েমানুষ হলো শক্তের ভক্ত! কোথায় তোমার বউ তোমাকে ভয় পাবে, না তুমিই তাকে ভয় পাও। তুমি রটিয়ে দাও যে তুমি আর একটা বিয়ে করবে। তারপর দেখো কী রকম দৌড়ে চলে আসে।

সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি দিলেন এক জার্মান মহিলা। তিনি বাংলাদেশের ডাক্তার সাহাবুদ্দিনকে বিয়ে করেছেন। ডাঃ সাহাবুদ্দিন সম্পর্কে কামালের চাচা হন। এই জার্মান মহিলার নাম গারট্রুড, এখন তিনি প্রবীণা। কামালের সব কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনে তিনি বললেন, কামাল, এখন কিছুদিন তোমাদের মধ্যে দূরত্ব রাখা দরকার। অন্তত দু'তিন মাস তুমি ওর সঙ্গে দেখা করো না, চিঠি লিখো না, ফোনেও কথা বলো না। তোমরা দু'জনেই নিজেদের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করো। তারপর সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। সময়ের ব্যবধান আর দূরত্বই হলো ভালোবাসার ফাটল সারাবার শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

কামাল ইণ্ডিয়া চলে গেলো। তার ব্যবসার কিছু কাজও ছিল। মাঝখানে কয়েক মাস সে ব্যবসার ব্যাপারে একেবারে মন দিতে পারেনি, যদিও এখন বাজার বেশ চাঙ্গা, একটু খাটলেই অনেক কিছু করা যায়।

ইণ্ডিয়ায় এসে প্রথম কয়েক মুহূর্ত দারুণ ছটফটানির মধ্যে কাটলো। এক মুহূর্তও সে জুলেখার কথা ভুলতে পারে না। রাত্রে হোটেলের ঘরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হয় জুলেখা বুঝি পাশে শুয়ে আছে।

ইচ্ছে করে ট্রাংকলে জুলেখার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু গারট্রুডের কথা মনে পড়ায় সে আবার সংযত হয়।

একমাস পর তার মন আবার বদলে যায়। মনে হয়, সবটাই দুঃস্বপ্ন মাঝখানে কিছু ঘটে নি। নিতান্ত ছেলেমানুষি অভিমানের ব্যাপার। জুলেখা কখনো তাকে ছেড়ে বেশি দূরে থাকতে পারে? অসম্ভব। জুলেখা তাকে বলেছিল তার বাহুতে মাথা না রেখে শুলে জুলেখার ঘুম আসে না। সে তাহলে এখন নিদ্রাহীন রাত কাটায় বোধহয়।

কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে সে জুলেখার জন্য দু'টি দামি শাড়ী কিনলো আর কিছু গয়না। টুকিটাকি উপহারের জিনিস। মীনা বৌদির একটা শাড়ি দেখে জুলেখার শখ হয়েছিল ঐ রকম শাড়ির। কামাল তার চেয়েও ভালো শাড়ি নিয়েছে।

জুলেখা বেড়াতে ভালোবাসে। হাতে এখন কিছু টাকা আছে। এবারে জুলেখাকে নিয়ে সমুদ্র-ভ্রমণে যেতে হবে। জুলেখা পড়াশুনো করতে চায় করুক! যতদূর ওর ইচ্ছে। টাকা পয়সা নিয়ে আর কোনোদিন জুলেখাকে চিন্তা করতে হবে না।

কলকাতা থেকে সে চলে এলো ঢাকায়। শেখ মুজিব কিছুদিন আগে নিহত হয়েছেন, তারপর জেলের মধ্যে খুন হলেন তাজুদ্দিন এবং অন্য বড় বড় নেতারা। দেশে অরাজক অবস্থা।

ঢাকায় এসে কামাল একবারও টাইগারের খোঁজ করলো না। টাইগারকে সে দেখতে চায় না। টাইগারের ওপর রাগও নেই। সে ঐসব কথা মন থেকে মুছে ফেলেছে।

ঢাকায় তার মন টিকলো না। তার সব সময় মনে হচ্ছে জুলেখা যেন এরই মধ্যে মন্ট্রিয়েল থেকে ফিরে তার জন্য বস্টনে অপেক্ষা করে বসে আছে। আসবার আগে সে জানিয়ে এসেছে জুলেখার মাকে। একটা চাবি রেখে এসেছে সিরাজুলদের এপার্টমেন্টে!

ফেরার পথে সে ইউরোপের কোথাও নামল না। যদিও অ্যামস্টারডাম স্টপ ওভার ছিল কিন্তু সে সোজা চলে এলো বস্টনে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আসার পথে তার বুক টিপ টিপ করছে। জুলেখা এসেছে কি আসেনি? তার মন বলছে এসেছে। অনেকদিন হয়ে গেল, না এসে সে পারবে না, এটাই তো তার নিজের বাড়ি।

কামাল দরজায় বেল দিলো, যদিও চাবি তার পকেটে। কেউ দরজা খুললো না। তাকেই চাবি লাগাতে হলো। শূন্য নির্জন ফ্ল্যাট! অনেক দিন বন্ধ হয়ে থাকায় গুমোট গন্ধ।

কামালের ফিরে আসার খবর পেয়ে সিরাজুলও নেমে এসেছে। সে জানালো কেউ চাবি নিতে আসে নি, কেউ কোনো খবরও জানতে চায়নি। মন্ট্রিয়েল থেকে ফোন আসে নি।

এখন রাত পৌনে দশটা। এই সময় জুলেখা নিশ্চয়ই বাড়ি থাকবে, কামাল ফোন তুলে নিলো। সৌভাগ্যের কথা আর কেউ না, জুলেখাই ফোন ধরেছে।

কামাল উৎফুল্লভাবে বললো, জুলি! তোমরা কেমন আছো সবাই? আমি এইমাত্র ফিরে এসেছি, এসেই তোমাকে ফোন করলাম।

জুলেখা বললো, বলন, আমরা ভাল আছি।

কামাল শোন এই উইক এণ্ডেই আমি চলে আসছি। তোমরা কলেজ কেমন চলছে? তুমি তৈরি হয়ে থেকো, তোমাকে নিয়ে আসবো।

জুলেখা ঠাণ্ডা গলায় বললো, তোমাকে আসতে হবে না। আমি যাবো না। আমি আর কোনদিনই যাবো না ঠিক করেছি। আমি ডিভোর্স চাই! মুসলিম আইনে সহজভাবে যদি ডিভোর্স দাও তাহলে ভালো, না হলে আমি কোর্টে যাবো।

কামাল আতঙ্কিতভাবে বললো, কী পাগলের মতন কথা বলছো জুলি? সব তো মিটে গেছে?

কিসের সব মিটে গেছে?

বাঃ, আমাদের আর কী গণ্ডগোল আছে? আব্বা-আম্মা চলে গেছেন। ওমর সাহেব চলে গেছেন। এখন তুমি আর আমি আগের মতন থাকবো খুশিমতন।

তোমার যেমন খুশি তুমি থাকো। আমি আর কোনদিন যাবো না।

জুলি, তুমি এমনভাবে কথা বলছো কেন? তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না? আমি তো জানি, আমাদের ভালোবাসা কোনোদিন নষ্ট হবার নয়।

আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। আমার জীবনে আর তোমার কোন স্থান নেই। তুমি সহজভাবে ডিভোর্স দিয়ে দাও তো ভালো, নইলে আমার ল-ইয়ারের চিঠি পাবে! এই আমার শেষ কথা!

শোনো, জুলি, শোনো!

জুলি ফোন রেখে দিয়েছে।

দরজার কাছে তখনও দাঁড়িয়ে আছে সিরাজুল। সে জিজ্ঞেস করলো, কামাল চাচা, ভাবী আসবেন না? বেবীটা প্রায়ই ভাবীর কথা জিজ্ঞেস করে।

নিঃস্ব মানুষের মতন কামাল বললো, নাঃ। তোর ভাবী আর আসবে না রে!

৮

এ পর্যন্ত কামালের কাহিনীতে সে রকম কোনো বৈচিত্র নেই। অনেকটা ত্রিকোণ প্রেমের ব্যাপার, ভালোমানুষ, বিশ্বাসপ্রবণ স্বামী তার রোমান্টিক স্বভাবের স্ত্রী এবং একজন পার্ট টাইম প্রেমিক, এরকম আকছার দেখা যায়।

এর পরে অবশ্য এ কাহিনীর সম্পূর্ণ অন্য একটা ভাষ্য জানা গেল। যাই হোক, এই পর্যন্ত শোনার পর আমি কামালকে বললুম, দ্যাখো, সব ঘটনাটাই তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা। সুতরাং একপেশে হতে বাধ্য। এ কাহিনীতে তুমি একেবারে নিখুঁত, নির্দোষ। অথচ ঘটনাপ্রবাহে তুমিই বঞ্চিত হয়েছো। এরকম কী হতে পারে?

কামাল বললো, যা যা ঘটেছে তা আমি তোমাকে সত্যিই বলেছি, কিছুই বানাইনি। আমারও কিছু কিছু দোষ হয়েছে, তা তো গোপন করি নি।

তুমি বানিয়ে কিছু বলো নি তা জানি! কিন্তু কোনো মানুষই একরঙা হয় না চরিত্রের নানা দিক থাকে। কিন্তু কেউ যখন কাউকে বর্ণনা করে তখন সাধারণত তার চরিত্রের একটা দিকের কথাই বলে। জুলেখা, তার মা, ওমর, তোমার মা এদেরও আলাদা পয়েন্ট অফ ভিউ থাকতে পারে। জুলেখার মুখ থেকে কাহিনীটা শুনলে হয়তো সম্পূর্ন অন্যরকম শোনাতো।

কিন্তু ঘটনা তো সবই এক। ঘটনার মধ্যেও ছোট ছোট ফাক থাকে। যেমন ধরো, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ওমরের ওপর তোমার কোনোদিন খুব রাগ হয় নি। শেষের দিকে সে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে শুরু করেছিলো। অথচ তুমি তখনও ঠাণ্ডা মেরে ছিলে।

না, শেষের দিন হঠাৎ এক সময় খুব রাগ হয়েছিল। আমি ওমরকে একটা ধাক্কা মেরেছিলাম, সে মাটিতে পড়ে গেলো।

এই দ্যাখো, এই সব খুঁটিনাটি তুমি বাদ দিয়েছো। এই গুলোই তো আসল। তোমারও রাগ হয় তাহলে?

হা- হা- হা! তুমি কি আমাকে সদাশিব ভাবো? আমার রাগ নাই?

ঈর্ষা থাকলেই রাগ থাকবে। চরম ভালোবাসা অনেক সময় চরম ঈর্ষা ডেকে আনে। সেই ঈর্ষায় চোখ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন অতি নগণ্য ছোটখাটো ব্যাপারেও সন্দেহ হয়। যাকগে ওমরকে তুমি মারতে গিয়েছিলে কেন?

মারতে যাই নি, কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময়ে মাথায় আগুন জ্বলে গেল, আমি একটা ধাক্কা মেরে বসলাম। আমার গায়ে জোর আছে, আমি চাইলে ওমরকে মেরেই ফেলতে পারতাম। কিন্তু ঐ ধাক্কাটা মেরেই আমার দারুণ অনুতাপ হলো আমি নিজেই তুলে ধরলাম তাকে, প্রচুর ক্ষমা চাইলাম। ঐ ধাক্কাটা এমন কিছু না, ওমরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেদিনই শেষ হয়ে যায়নি, তারপরেও অনেকবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে।

কিন্তু সেদিন ধাক্কাটা মেরেছিলে কেন? তোমার বর্ণনা শুনে তো মনে হলো, তুমি ওমরকে ঠিক সন্দেহ করো নি।

যে পর্যন্ত বলেছি, তখনও ঠিক করি নি। কিন্তু তারপরেও শুধু সন্দেহ নয়, প্রমাণ পেয়েছি অনেক।

তবু ওমর বা জুলেখাকে চোখে দেখলে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে আমি হয়তো স্পষ্ট ধারণা করতে পারতুম। কাহিনীর একটা অন্য দিক চোখে পড়তো। তোমাকে আর একটা কথা বলবো, কামাল?

বলো!

এ পর্যন্ত যা শুনেছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে নিছক একটা তুচ্ছ কারণে তুমি জুলেখাকে প্রথমে শাস্তি দিতে চেয়েছো।

শাস্তি?

রাতের পর রাত স্ত্রীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থাকা একটা শাস্তি নয়! তোমার মায়ের কথা শুনে তুমি জুলেখার ওপর চাপ দিয়েছো। আমি হলে টাইগারকে বেনিফিট অব ডাউট দিতাম।

WWW.BANGLABOOK.COM

কেন?

তোমার মায়ের বয়েস হয়েছে। ওরা অন্য জেনারেশনের। ওদের নীতিজ্ঞান অন্যরকম। বাড়ির বউয়ের সঙ্গে বাইরের একটি ছেলের খোলামেলাভাবে মেশা ওরা ভালো চোখে দেখেন না। কিন্তু আজকাল এতে কী আসে যায়? আমার তো মনে হচ্ছে, টাইগার একটা একস্ট্রোভার্ট ধরনের ছেলে। তোমাকে সে ভালোবাসে, তোমার অনুপস্থিতিতে বৌদির যাতে মন খারাপ না হয় তাই সে সঙ্গ দিয়েছে। হাসি ঠাট্টা করেছে, হয়তো ফষ্টি-নষ্টিও করেছে, তার বেশি কিছু না।

না, তার অনেক বেশি। আমি সে ভালো করেই জানি।

তারপর ওমর সম্পর্কে তোমার মীনা বৌদি বা মা যা বলেছেন সে সম্বন্ধেন তুমিই বলেছো যে ওমরের ব্যবহারে কোনো খুঁত নেই। তাহলে ওমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী থাকতে পারে? হয়তো জুলেখা চলে যাওয়ার ব্যাপারে ওমরের কোনো ভূমিকা নেই।

এতসব শুনে তুমি এই বুঝলে? তাহলে আমারই অক্ষমতা, আমি ঠিক মতন বুঝতে পারিনি।

ওমর এখন কোথায় থাকে? তার সঙ্গে দেখা করে আলাদাভাবে কথা বলা যায় না?

ওমরের সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারবে না, তবে সব কথা তুমি শুনতে পারো।

তার মানে?

ওর সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে তা সব টেপ করা আছে। শুধু ওর কথা নয়, জুলেখা তার আম্মা, মীনা ভাবী, মিতা সবার কথা টেপ করা আছে।

এবারে আমার অবাক হবার পালা। আমি হাঁ করে কামালের দিকে তাকিয়ে রইলুম একটুক্ষণ। তারপর বললাম, সে কি, তুমি সবার কথা টেপ করেছো, জানিয়ে শুনিয়ে নাকি...

কামাল হাসতে হাসতে বললো, জানিয়ে শুনিয়ে করলে তো সবাই কনসাস হয়ে যাবে। কেউ জানে না।

তুমি তো সাংঘাতিক লোক? লোককে না জানিয়ে সব টেপ করে নাও! কবে থেকে শুরু করলে?

জুলেখা চলে যাবার পর। তার আগে এসব জিনিস আমার মাথাতেই আসতো না। কেন টেপ করতে শুরু করলাম সেটা শোনো। একসময় বুঝতে পারলাম, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সবাই উল্টোপাল্টা বলছে। আমায় পাগল সাজাবার চেষ্টা করছে। আজ এক মানুষ এক কথা বলে কাল সে তাই ডিনাই করে। মীনা বৌদি আমাকে বারবার ওমরের নামে সাবধান করেছেন, বলেছেন, ওমরকে বিশ্বাস করা যায় না, অথচ ওমরের সঙ্গে দেখা হলে তিনি একেবারে গলে যান, তখন কত খাতির। জুলেখার মা তো আজ যা বলবেন পরের দিনই সেটা অস্বীকার করবেন। ঐ যে মিতা আমাকে বলেছিল, ওমরকে সে ভয় পায়, ঢাকায় থাকতে ওমর ওর ওপর অ্যাটেম্পট নিয়েছিল, সেই মিতাই দেখি একদিন ওমরের সঙ্গে নিউটনে বেড়াতে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলে অন্য কথা বলে। সেইজন্য সকলের কথা টেপে তুলে রেখেছি। শুনবে?

শোনাও।

তার আগে বলি টেপ করার আইডিয়াটা কী-করে আমার মাথায় এলো।

অন্যদের না জানিয়ে টেপ করেছো কী করে?

টেলিফোনের কনভারসেশান তুলে রাখা তো সোজা। আর অন্যদের বাড়িতে যখন দেখা করতে যেতাম, তখন একটা ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার বেঁধে দিয়ে যেতাম। মোজার তলে সেটা ঢাকা থাকতো। কথা বলতে বলতে পা চুলকোবার ভান করে নিচু হয়ে সেটা চালু করে দিতাম। স্পাই স্টোরিতে এরকম পড়েছি। সত্যি কেউ করে জানতুম না। আইডিয়াটা প্রথমে কীভাবে এলো সেটা শোনো। তুমি তো জানোই, এদেশে তুমি নানা জায়গায় যে সব চেক কাটো, ব্যাঙ্ক থেকে মাসের শেষে সেইসব ইউজড চেক তোমার কাছে ফিরে আসবে। একবার দেখি জুলেখার নামে কাটা একটা চেক চলে এসেছে আমার কাছে। সেই চেকে সই করেছে ওমর আলী। উল্টে পিঠ দেখে বুঝলাম, জুলেখা সেই টাকায় মন্ট্রিয়েলে টেলিফোনের একটা বিল মিটিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝলে? জুলেখা ওমর সাহেবের সঙ্গে লং ডিসটেন্সে কথা বলেছে অনেকক্ষণ, ওমর সেই বিলটা পে করে দিয়েছে।

ইউজড চেকটা তোমার কাছে ফিরে এলো কী করে?

আমাদের মুসলমানদের তো কোনো পদবী নাই। স্বামী আর স্ত্রীর নাম শুনলে কেউ বুঝবে না যে তারা স্বামী স্ত্রী। এদেশে তাতে খুব অসুবিধা হয়, ইমিগ্রেশানে ঝামেলা করে। তাই এদেশে স্বামীর নামের শেষটা আর স্ত্রীর নামের শেষটা একই রাখি আমরা। সেটাকেই এরা পদবী মনে করে। সেই জন্যই জুলেখার টাইটেল দেখে পোস্টম্যান সেটা আমার ডাক বাক্সে দিয়ে গেছে।

বুঝলাম।

আমার বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় ওমর সাহেব বলেছিল জুলেখার সাথে তার আর কোনো কানেকশান নাই, টেলিফোনেও কথা হয় না। অথচ এখন বোঝা গেল, ও প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে, আর ওমর সাহেবের এত আগ্রহ যে নিজেই সেই খরচা দেয়! তখনই ঠিক করলাম ওমর সাহেবের ফোন ট্যাপ করতে হবে। ওরা কী বলে তা শুনবো।

ওমর তখন অন্য বাড়িতে চলে গেছে।! কী করে তুমি ওর ফোন ট্যাপ করবে?

তারও উপায় একটা বেরিয়ে গেয়। ঐ যে সিরাজুল ছেলেটির কথা বলেছি, আমার সে খুব ভালোবাসতো তার বয়েস তখন সতেরো-আঠারো। জুলেখা চলে যাওয়ার ঘটনা সে মোটামুটি জেনেছিলো, আমার দিকেই ছিল তার সিমপ্যাথি। আমি সিরাজুলের সাহায্য নিলাম। সে প্রায়ই ওমর সাহেবের কাছে অঙ্ক-টঙ্ক দেখে নেবার জন্য যেত। আমি বললাম, সিরাজুল, তুই ওনাকে বলবি, এখানে অ্যাপার্টমেন্টে অনেক লোকজন। আপনি যখন দুপুরে বাড়িতে থাকেন না তখন আপনার ঘরে বসে আমি পড়াশুনা করতে পারি? ওমর আলী সিরাজুলকে সন্দেহ করে নি, রাজি হয়েছিল। একদিন দুপুরে সিরাজুল আমায় খবর দিলো, আমি ওর ঘরে গিয়ে ফোনটা র‍্যাগিং-এর ব্যবস্থা করলাম। তারপর নিচে বেসমেন্ট-এ গ্যালাম ঐ লাইনের পয়েন্টটা দেখতে। এমন সময় সিরাজুল ছুটতে ছুটতে এসে বললো, কামাল চাচা, ভাবীর চিঠি! ড্রয়ারের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে ওপরে এসে দেখলাম ওমরকে লেখা জুলেখার একটা দু'পাতার চিঠি। খুব টাটকা। চিঠিখানা নিয়েই দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের দোকানে ঢুকে চিঠিখানা জেরক্স করেই আবার ফিরে এসে সেটা রেখে দিলাম ঠিক জায়গায়। সে চিঠির কপি আমার কাছে আছে।

কী ছিল সেই চিঠিতে?

সে চিঠির ভাষা তোমাকে বলতে পারবো না। আমার মুখে আসবে না। সেইদিনই আমার প্রকৃত সর্বনাশ হলো।

শুধু ঐ একটা চিঠি পড়েই তোমার এমন হলো?

সমস্ত বিশ্বাস যে তাসের ঘর, এক নিমেষে ভেঙে গেল। যদি সেই চিঠিতে প্রেমের কথা থাকতো আমি বোধহয় অতটা দুঃখিত হতাম না। ওমরের সঙ্গে জুলেখার একটু আধটু প্রেম তো হতেই পারে। এমন কি গভীর প্রেম হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তেমন হলে আমি সরে যেতাম। দরকার হলে ওদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতাম। কিন্তু ঐ চিঠিতে আছে শুধু শরীর। শুধু সেক্স। বিকৃত উল্লাস। কত রকমভাবে ওরা পরস্পরকে এনজয় করেছে সেই বর্ণনা একেবারে কদর্য ভাষায়, আর জুলেখা জানতে চেয়েছে, আবার কবে ওরকম হবে!

কামাল একটু চুপ করে গেল। আমিও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। জুলেখাকে আমি রোমান্টিক ধরনের মেয়ে ভেবেছিলুম। অবশ্য রোমান্টিকতার সঙ্গে যৌনতার কোনো বিরোধ নেই, বরং বেশ নিকট সম্পর্ক। কিন্তু চিঠিতে যৌন ব্যবহারের বর্ণনা যেন কেমন কেমন! রোমান্টিক আর যাই হোক খারাপ ভাষা ব্যবহার করে না।

কামাল একটু পরে বললো, সেইদিন থেকে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। জুলেখার স্লিপিং ট্যাবলেট খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো। ঢাকাতে জুলেখা টাইগারের সঙ্গে প্রেম শুরু করেছিল। যখন দেখলো ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে কেলেংকারি হয়ে যাবে, তখনই ও ঢাকা ছেড়ে এখানে চলে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তার পর আমি আমার সর্বস্ব উজাড় করে ভালোবাসা দিয়েছি, তাতেও সে সন্তুষ্ট হয়নি। ওর ঝোঁকটা লাম্পট্যের দিকে। ওমরকে দেখে বুঝেছিল এই আর একটা শিকাব। মিতার কাছে নিশ্চয়ই শুনেছিল ওমর মেয়েছেলে দেখলে ছাড়ে না। ঢাকায় ওমরের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে! আমার একটা দুর্বলতা ওরা জানতো। আমি কখনো একটু আপত্তি করলেই জুলেখা বলতো, তোমার মন এত ছোট, তুমি এই সামান্য ব্যাপারে সন্দেহ

করছো? আমি যখন থাকতাম না থখন তো যা খুশি কততোই, আমি বাড়ি থাকলেও ওরা মিট করতো ঠিকই। আমাকে বিছানায় শুইয়ে জুলেখা দুধ খাওয়াবার নাম করে ওমরের ঘরে যেতো। এক জায়গায় জুলেখা তাই নিয়ে ঠাট্টা করেছে। আমাকে বলতো দুধ খাওয়াতে যাচ্ছে, আসলে ও ঘরে ঢুকেই ব্লাউজ খুলে।

বুঝেছি!

আমার এক একদিন ইচ্ছে করতো, চুপি চুপি সেই সময় ওমরের ঘরে ঢুকে দেখি ওরা কি করছে। কিন্তু যেতে পারতাম না। তাতে যে আমি নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম।

কামাল, তুমি সাধারণ মানুষ হলে, রাগী, স্বার্থপর হলে হয়তো বেশি সুখী হতে।

আমার সব সাধারণই। আমি তো মনে করি, সবাই আমার মতন। তারপর শোনো, আমার আম্মা-আব্বা এসে পড়ায় ওদের লীলাখেলা ধরা পড়লো বলেই জুলেখা অত রেগে উঠলো। আম্মা একে আমাকে টাইগারের কথাটা বলে দিতেই জুলেখা বুঝলো আম্মার তীক্ষ্ণ চোখে ওমরের সঙ্গে সম্পর্কটাও ধরা পড়ে যাবে। তখন জুলেখা পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। ওমরই তাকে স্লিপিং ট্যাবলেট খাওয়ার পরিকল্পনটা দিয়েছিল। সে বলেছিল, সে নিজেই জুলেখাকে ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাবে!

ওমর খুবই বুদ্ধিমান। ভেরি ফুল অ্যাণ্ড ক্যালকুলেটিড।

শুধু একটা সময় ওমর ওর কুল হারিয়ে ফেলেছিল। হাসপাতালে জুলেখা যখন অজ্ঞান হয়ে যায় তখন ওমর একবার ভেবেছিল, জুলেখা সত্যি মরে যাবে না তো! সেই সময়ই ও বলেছিল, জুলেখার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে ও আমাকে ম্যাসাকার করে ফেলবে!

কামাল, ঐ চিঠিটি পড়ার সময় তোমার মনের অবস্থা ঠিক কী রকম হয়েছিল!

প্রথমে চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। পায়ের নিচে মাটি সরে গিয়েছিল। সিরাজুল পাশে ছিল তাই নিজেকে কোনোক্রমে সামলেছি, নইলে হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে যেতাম।

রাগ হয়নি?

অসম্ভব একটা রাগ হলো। সে কী রকম রাগ তোমাকে বোঝাতে পারবো না। মনে হলো, ওমর আলী একটা বিষাক্ত পোকা, ওকে জুতো দিয়ে থেঁতলিয়ে দেওয়া দরকার। ভাবলাম একটা গান ম্যান হায়ার করে ওকে সরিয়ে দেবো। জানো নিশ্চয়ই, এদেশে পঞ্চাশ-একশো ডলারে খুনী ভাড়া পাওয়া যায়। নিখুঁত কাজ করে দেবে, কোনো প্রমাণ থাকবে না। প্রথম দু-তিনদিন এই আইডিয়াটা নিয়ে কাটালাম।

শুধু ওমরের ওপরই রাগ হলো? জুলেখার ওপর নয়?

না, জুলেখার ওপর তখনও আসেনি। জুলেখার প্রতি আমার ভালোবাসা যে কোনো নিয়ম মানে না! দু-তিনদিন বাদে আমি পরিকল্পনাটা পাল্টে ফেললাম। শুধু মৃত্যুই ওমরের যথেষ্ট শাস্তি নয়। আমার যে ক্ষতি সে করেছে তার জন্য সারাজীবন বেঁচে তাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। ঠিক করলাম, ওমরকে আমি ব্ল্যাক মেইল করবো। তার কাছে গিয়ে বলবো, আমি তোমার কীর্তি কাহিনী সব ফাঁস করে দেবো, এমন অবস্থা করবো যাতে তুমি কোনোদিন দেশে ফিরতে না পারো। এসবগুলো না করতে পারি একটি মাত্র শর্তে। তুমি প্রতি বছর দু'জন করে অনাথ ছেলের প্রতিপালনের ভার নেবে। ঢাকায় দু'টি অনাথ বালকের ভরণ-পোষণের ভার নিতে হবে। সারাজীবন তোমাকে আমি লক্ষ্য রাখবো, কখনো কথার খেলাপ করলেই তোমাকে আমি খুন করবো।

চমৎকার পরিকল্পনা, কিন্তু অবাস্তব!

জানি, এটাও পাল্টে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। এর মধ্যে একদিন ফোন করলাম জুলেখার মাকে। তিনি আবার অপমান করলেন। ভদ্রমহিলার চরিত্রে অদ্ভুত একটা ডুপ্লিসিটি আছে। এই মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, আবার পরের মুহূর্তেই ছুরি বেঁধাবেন। তখন ঠিক করলাম একেও খুন করবো। এই মহিলাই যত নষ্টের গোড়া। ইনি মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, আমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে জুলেখার সম্পর্ক বিষিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ভাঙ্গা সংসার জোড়া দেবার বদলে ফাটলটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভাবলাম আম্মুকে আর ওমর আলীকে খুন করবো নিজের হাতে।

হাঃ হাঃ হাঃ! কামাল, তুমি মানুষ খুন করবে! অত সহজ নাকি?

তুমি হাসছো? কিন্তু মানুষ রাগের মাথায় কত কী করে ফেলতে পারে। কেউ কি জন্ম থেকে খুনী হয়? পরিবেশই তাকে খুনী করে তোলে! আমি নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিলাম। ক্যানাডায় কোনো গ্রামের

দিকে একটা ফার্ম হাউস ভাড়া নেবো। কাছাকাছি কোনো মানুষজন থাকবে না। আম্মু আর ওমরকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে যাবো সেখানে। তারপর কুচি কুচি করে কাটবো। তারপর একটু একটু করে কমোডে ফ্লাস করে চিহ্ন লোপাট করে দেবো।

হা-হা-হা!

তুমি হাসলে কী হবে। আমি ক্যানাডায় সত্যিই ঘুরে ঘুরে একটা নির্জন ফার্ম হাউস পছন্দ করে এসেছিলাম পর্যন্ত।

সিনেমায় এরকম হয়। তুমি নিশ্চয়ই কোনো টিভি সিরিয়াল দেখে এই আইডিয়াটা পেয়েছিলে? তাই না? এসব তোমার কর্ম নয়।

শুধু সিনেমায় কেন, বাস্তবেও এরকম হয়। কিন্তু আমি পারিনি। এই ব্যর্থতার ধাক্কাও কম নয়। যখন বুঝতে পারলাম, এ কাজ কিছুতেই আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তখন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আমি এতই অক্ষম যে কিছুই করতে পারি না?

আর কোনো পরিকল্পনা করোনি?

হ্যাঁ, এর পরে ভাবলাম, সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবো। আমার অ্যাপার্টমেন্ট, আমার গাড়ি, আমার অন্যান্য জিনিসপত্তর যেমন আছে তেমন পড়ে থাকবে, শুধু আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আমি আফ্রিকার কোনো দেশে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবো, যেখানে আমাকে কেউ চিনবে না!

গুড আইডিয়া।

কিন্তু এই আইডিয়াটাও বেশিদিন টিকলো না। আমি ভাবলুম, আফ্রিকায় গেলেও তো আমি জুলেখাকে ভুলতে পারবো না। যতদিন বেঁচে থাকবো জুলেখার কথা আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবে! সুতরাং অনেক দূরে চলে যেতে হলে আমাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়।

কী সাংঘাতিক কথা! এসব তুমি একা একাই ভাবতে, তোমার কাছাকাছি আর কেউ ছিল না।

না! চেনাশুনা কাউকেই তখন আমি বিশ্বাস করতাম না। একবার কী হলো জানো? জুলেখা তো ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমাদের চমক দিয়েছিল। আমি ঠিক করলাম, আমি ঐভাবে মরবো। ঘুরে ঘুরে ঘুমের ওষুধ জোগাড় করতে লাগলাম! বিভিন্ন দোকান থেকে। সবসুদ্ধ একশো ছাপান্নটা ট্যাবলেট জোগাড় হলো। তারপর গুঁড়া করলাম। একটা পাউডারের মতন হয়ে গেল তা, সেসব একটা প্যাকেটে করে রাখলাম পকেটে। যে-কোনো সময়ে দুধে গুলে খেয়ে ফেলবো।

আমি হাত বাড়িয়ে কামালের বাহু ছুঁয়ে বললুম, কামাল, তুমি খুব দুঃখী, তাই না?

কামাল অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, এখন তুমি ওসব কথা বললে কী হবে? তখন তো কেউ আমার পাশে ছিল না। ওমর আর জুলেখা এমনভাবে ব্যাপারটা সাজিয়েছিলো যেন সব দোষ আমার ওপর পড়ে। জুলেখার আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য আমিই দায়ী! ওঃ, কী যে অসহ্য অবস্থা গেছে!

সেই বিষের প্যাকেট কে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিল?

কেউ নেয়নি। সবসময় সেটা পকেটে রাখতাম। যে-কোনো সময় খেতে পারি, কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্ত খুঁজছিলাম। এদিকে তখন তো জুলেখা ডিভোর্সের জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। তাই নিয়ে নানারকম কথা বলাবলি চলেছে। আমি ডিভোর্স দিতে রাজি নই। এই সময় জুলেখার চাচা এলেন ঢাকা থেকে। ঠিক হলো যে একটা মিটিং হবে। সেখানে সব ঠিক হবে। জুলেখার চাচা মধ্যমণি হয়ে সব ব্যবস্থা করবেন।

আর একজন নিগোশিয়েটর?

ফাইন্যাল নিগোশিয়েটর। এরপর হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। জুলেখার চাচা একজন প্রবীণ, বিদ্বান, শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁর কথা সবাই শুনবে। তাঁর সঙ্গে বস্টনে প্রথম দেখা হলো। তিনি প্রথমেই আমাকে বললেন, কামাল, মানুষের জীবন অতি মূল্যবান। জীবনটা নিয়ে ছেলেখেলা কোরো না! আমি দেখছি, আমি কতটা কী সমাধান করতে পারি, তার আগে হুট করে কিছু করে বোসো না। তাঁর এই কথা শুনে আমি চমকে গেলাম। উনি কি কিছু আন্দাজ করেছেন? কেন এই কথা বললেন?

তারপর?

তারপর কয়েকদিন বাদে আমি চলে এলাম ক্যানাডায়। মন্ট্রিয়েলে অন্য একটা বাড়িতে উঠলাম। সেখানে আব্বা-আম্মা ছিলেন। চাচা একদিন এলেন সেখানে। দু-একটা কথা বলে আমি চলে গেলাম

ভেতরে। আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। সিঁড়ির ধারে একটা খাটে আমি শুয়ে পড়লাম। জায়গাটা অন্ধকার মতন। আমায় কেউ দেখছে না! আমি যেন ঘুমিয়েও না, জেগেও না। অন্যদের কথা সব শুনতে পাচ্ছি, নিজে কোনো কথা বলতে পারছি না। একসময় শুনলাম, আতিকুল চাচা অন্যদের সঙ্গে কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমার কথা তিনি একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম পাউডারটা তখনই খেয়ে ফেলি। তারপর ভাবলাম এভাবে তো নয়। জুলেখাকে জানতে হবে আমি সত্যি সত্যি কী চেয়েছিলাম। তক্ষুণি উঠে গাড়ি নিয়ে চলে এলাম জুলেখাদের বাড়িতে। জানি, জুলেখা আমার সঙ্গে দেখা করবে না। তবু কারুর না কারুর সঙ্গে তো দেখা হবে।

কার সঙ্গে দেখা হলো?

আতিকুল চাচার সঙ্গে। তিনি দরজার সামনেই ছিলেন। আমি তাকে বললাম, চাচা, আলোচনা সভা, মিটিং-মুটিংয়ের তো কোন দরকার নাই। আমার আর জুলেখার নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে অন্য লোকে এত মাথা ঘামাবে কেন? আপনে জুলেখাকে ডাকেন একবার। এই যে প্যাকেটটা দেখছেন, এর ভিতরের জিনিসটা কিছুর সঙ্গে মিশায়ে জুলেখা দিক আমাকে আমি জুলেখার কোলে মাথা দিয়ে শোবো শেষবারের মতন, সব মীমাংসা হয়ে যাবে।

উনি কী বললেন?

আতিকুল চাচা বললেন, তুমি কী ছেলেমানুষি করছো? জুলেখা নাই এখানে। তুমি ঐটা আমাকে দাও তো! তিনি প্যাকেটটা প্রায় জোর করেই কেড়ে নিলেন আমার কাছ থেকে।

দ্যাট ওয়াজ দা ওয়াইজেস্ট থিং টু ডু!

তুমি তো এখন সেই কথা বলবেই। তখন তো দ্যাখো নাই আমাকে। আমি একেবারে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো কিছু ঘটে যেতে পারতো!

কামাল, তুমি যে অনেকের কথা টেপ করে রেখেছিলে বললে, সেগুলো শোনাবে?

এখন শুনবে? দাঁড়াও, মেশিনটা আনি।

একটা দুটো ক্যাসেট নয়। ডজনের পর ডজন, সব মিলিয়ে বোধহয় একশোর বেশি হবে। দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ! এত সব আমি শুনবো কতদিন ধরে? অসম্ভব ব্যাপার, কতদিন ভালো করে গান শোনা হয় না, শুধু শুধু মানুষের কথাবার্তা শুনে কী হবে?

কয়েকটা ক্যাসেট টুকরো টুকরোভাবে শুনেই আমার হাই উঠতে লাগলো। প্রায় একই রকমের কথা। জুলেখা চলে যাবার পর, ওমরের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জেনে যাবার পরও কামাল প্রত্যেকের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে, জুলেখাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য। এই একই কথা জনে জনে প্রত্যেককে। অনেকেই সান্ত্বনা দেবার ছলে বিদ্রূপ করেছে তার সঙ্গে। কেউ কেউ ধমকাচ্ছে। ওমর আলীর কণ্ঠস্বর বেশ অ্যারোগ্যান্ট। সে এসব কিছুর দায়িত্ব থেকে নিজের হাত ধুয়েমুছে ফেলতে চায়। জুলেখার মা সব কিছুর জন্য দোষারোপ করেছেন কামালকে। জুলেখা বারবার ফোনের লাইন কেটে দিচ্ছে, কামাল তবু ভিখারীর মতন আবার ফোন করে শুধু তার কণ্ঠস্বর শুনতে চাইছে। মীনা বৌদি, মিতা, শামীম ওরা কামালের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও মনে মনে ভাবছে, কামাল পাগল হয়ে গেছে। তাদের কথার সুরে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

হয়তো সেই সময় কামালের এইরকম একটানা কাকুতি-মিনতি শুনলে আমিও তাকে পাগল মনে করতুম!

আমি বললুম, ঠিক আছে কামাল, মেশিনটা বন্ধ করো, এবারে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি।

কামাল বললো, আর শুনবে না?

আমি বললুম না, যথেষ্ট হয়েছে। ওতেই বুঝে গেছি। আমার প্রশ্ন: তুমি এত বাড়াবাড়ি করেছিলে কেন? জুলেখা তোমার সংসার ছেড়ে চলে গেছে, সে আর ফিরে আসতে চায় না। সে বারবার ডিভোর্স চাইছে, সে তোমাকে ভালোবাসে না বলে জানিয়েছে, তাও তুমি ডিভোর্স দিচ্ছিলে না কেন?

কামাল বললো, ঐসব জুলেখার মনের কথা নয়। শুধু রাগের কথা।

ছ'মাস কেটে গেছে, তারপরেও রাগের কথা। না, তা মনে হয় না ওর কথা শুনলে। জুলেখার মা-ও তো ডিভোর্সেরই পক্ষে দেখা যাচ্ছে।

উনি সবদিক বিবেচনা করে দেখেন নি। জ্যাক নামে একটা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ওনার তখন খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। একটা ট্যাপে শুনলে না জ্যাকের কথা। উনি ভেবেছিলেন, ওর সেই পুলিশ-প্রেমিকের সাহায্য নিয়ে আমাকে জব্দ করবেন।

এসব অবান্তর কথা। তোমার তো সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক ছিল ডিভোর্স দিয়ে ঝামেলামুক্ত হওয়া। তুমি তা দিতে চাওনি কেন?

কামাল আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললো, এর তিনটে কারণ আছে। সেগুলি যদি প্রশ্নের আকারে তোমাকে করি, তুমি উত্তর দিতে পারবে?

চেষ্টা করে দেখি।

প্রথম কারণ, আমি জানতে চেয়েছিলাম, আমার দোষটা কোথায়? কি জন্য আমার ব্যর্থতা? আমি আমার স্ত্রীকে আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েছি। তাকে বিশ্বাস করেছি। তার কোনো স্বাধীনতায় বাঁধা দেইনি, আমাদের শারীরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল, আনন্দময় ছিল, আমার আম্মা এসে পড়ার আগে আমার নামে জুলেখার কোনো অভিযোগ ছিল না। তবু সে কেন অবিশ্বাসিনী হলো? কেন সে সংসার ভাঙতে চাইলো? একজন স্ত্রী আর কি চায়? তাহ্যর বিবাহ জিনিসটা কী! তারপর ধরো ওমরের কথা। বিদেশেস এসে সে থাকার জায়গা পায় নি, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। আমি তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক হলে আমি বিন্দুমাত্র বাধা দেই নি। একজন মানুষকে আর একজন মানুষ এর চেয়ে আর কি দিতে পারে? তবু ওপরে ওপরে সে সব সময় আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও ভেতরে ভেতরে সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাহলে মানুষের বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই? কোনো মানুষই অন্য মানুষকে বিশ্বাস করবে না? আমি এর উত্তর জানতে চেয়েছি ওদের কাছে। ওরা সবাই এই প্রশ্ন এড়িয়ে দিয়ে উল্টো অভিযোগ দিয়েছে আমার নামে। তুমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো?

আমি মনে মনে ভাবলুম, মানুষ বড় বিচিত্র, মানুষকে নিয়মে বাঁধা যায় না। শরীরের আকর্ষণ যে কার প্রতি কার হবে তার কোনো ঠিক নেই, সেখানে সব ন্যায় নীতির দেওয়াল ভেঙে যায়।

কিন্তু এসব কথা মুখে বললে কেমন যেন ছেঁদো শোনায়। তাই বললুম, না, এর উত্তর আমারও জানা নেই। তুমি দ্বিতীয় কারণটি বলো।

কামাল বললো, দ্বিতীয় কারণটা হলো ভালোবাসা। সেইটা আসল কারণ বলতে পারো। জুলেখা এতসব গণ্ডগোল করলেও তার প্রতি ভালোবাসা যে আমার একটুও কমে নি। আমার বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে ভালোবাসা। সে ভালোবাসা জুলেখা ছাড়া অন্য আর কোনো নারীকে দেওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারি না। জুলেখাকে যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে সেই ভালোবাসা নিয়ে আমি কি করবো তা বলতে পারো?

না, এই উত্তরও আমি দিতে পারি না। কে কতখানি ভালোবাসার বোঝা বহন করবে, কে তার ভালোবাসা অন্য কতজনের সঙ্গে ভাগ করে নেবে, এটা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেক আন্তরিক ভালোবাসা দেড় বছরে ক্ষয়ে যায়।

তোমার তৃতীয় কারণটা শুনি।

তৃতীয় কারণ, আমি জুলেখার স্বার্থ সম্পর্কে ভেবেছিলুম। ডিভোর্স দিয়ে দিলে তারপর জুলেখার কী হবে? ও যে বিপদে পড়বে। ওমর আলীর সঙ্গে তো জুলেখার প্রেম ছিল না, ছিল শুধু শরীরের সম্পর্ক তা তো বেশি দিন টেকে না। এর মধ্যে ওমর আস্তে আস্তে সরে পড়েছিলো, মেলামেশা শুরু করেছিলো অন্য মেয়ের সঙ্গে। দেশে তার বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। মোটকথা জুলেখাকে সে স্ত্রীর সম্মান দেবে না। সেই জন্য আমি জুলেখাকে ডিভোর্স দিতে চাইনি।

তুমি এতো সব জেনেও জুলেখাকে নিঃশর্তে ফিরিয়ে নিতে রাজি ছিলে?

হ্যাঁ, ছিলাম। আগের সব কিছু ধুয়েমুছে ফেলতাম! আগে দু'একজনের সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে, তাতে কী হয়েছে? ডিভোর্স মেয়েকে কিংবা বিধবা মেয়েকে কি মানুষ বিয়ে করে না? তারা সুখী হয় না? জুলেখা ফিরে এলে আমি নতুন করে বিয়ের অনুষ্ঠান করতাম।

তুমি ডিভোর্স কতদিন আটকে রাখলে? সেই যে জুলেখার চাচা এলেন মধ্যস্থতা করার জন্য, সেই মিটিং হয়েছিল?

তার আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা আবার আমার জীবনের একটা মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ভালো করে ডিটেইলসে বলো।

সেই মিটিং নিয়ে কথাবার্তা চলছে। কবে হবে, কোথায় হবে, কে কে থাকবে। তার আগে একদিন আমার মাথায় একটা অন্য চিন্তা হলো। আমি ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত দশজনের সামনে আমাদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে আলোচনা হবে! সেইখানে ঠিক হবে জুলেখা আর আমি পরস্পরকে ভালোবাসি কিনা? এটা একটা ভালগার ব্যাপার না? কেন, আমরা নিজেরা মিটিয়ে নিতে পারি না?

জানো তো আমার মাথাটা মাঝে মাঝে কী রকম যেন খালি হয়ে যায়। এই কয়েক মাস ধরে যত দুশ্চিন্তা করেছি, সব হঠাৎ কোথায় জানি চলে গেল। মনে হলো, জুলেখার সামনাসামনি গিয়ে যদি সব কথা খুলে বলি, তার সঙ্গে ঠিকমত কমুনিকেট করি তাহলে সে ঠিকই বুঝবে।

চলে গেলাম সোজা মন্ট্রিয়েল। ইণ্ডিয়া থেকে সেই যে শাড়ি আর অন্য উপহারের জিনিসগুলো কিনেছিলাম, সেগুলি নিয়ে গেলাম সঙ্গে। পৌছলাম যখন, তখন রাত নয়টা বেজে গেছে। আম্মুর সঙ্গে দেখা হলো প্রথমে। জুলেখা পাশের ঘরে পড়াশুনা করছে। আমি ডাকলেও সে এলো না!

আম্মু কিন্তু আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করলেন, খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগলেন কেন জানো তো? যাতে মিটিং-এর দিন আমি আর গণ্ডগোল না করি! ডিভোর্স চাইলে দিয়ে দিই। আম্মু বললেন, কামাল, তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তুমি একটু যত্ন নাও। তোমার সামনে মস্ত বড় জীবন পড়ে আছে, তুমি অনেক উন্নতি করবে, এর মধ্যে কত লোক আসবে যাবে, তোমাকে তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে চলবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বললাম, আম্মু আপনি একবার জুলেখাকে ডাকেন, তার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আম্মু বললেন, সে তো পড়ার সময় ডিস্টার্ব করলে খুব চটে যায়। পড়ার ব্যাপারে সে খুব সিরিয়াস। তার সাথে তোমার কী কথা আছে, তা আমাকেই বলো না। জুলেখা তো আমার সাথে সব বিষয়েই আলোচনা করে, সে কিছু লুকায় না।

আমি বললাম, সে কথা শুধু তাকেই বলবো। ওর জন্য কয়েকখানা শাড়ি এনেছি, এগুলি রাখেন।

শাড়িগুলি দেখে আম্মুর বেশ পছন্দ হলো। তিনি সেই শাড়ি হাতে তুলে পাট খুলে দেখলেন, তারপর তা সরিয়ে দিয়ে বললেন, না এসব এখন আমরা নিতে পারি না। তোমার কাছ থেকে এখন এসব অ্যাকসেপ্ট করলে তার ভিন্ন মানে দাঁড়াবে। এখন ডিভোর্সের কথা চলছে, তোমার সাথে এখন দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নাই, তুমি জুলেখার নিজের শাড়ি ওভারকোট, জুতা ওসব ফিরিয়ে দাও নাই কেন?

আমি বললাম, সে সব জুলেখার নিজের জিনিস, সে নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে। আমি দিতে যাবো কেন?

তারপর আম্মু সেই পুরোনো পোশাকের কথা নিয়েই ধানাই-পানাই করতে লাগলেন অনেকক্ষণ। রাত বাড়তে লাগলো। আমি বললাম, এখনো কি জুলেখা পড়ছে? একবার তারে ডাকেন।

আম্মু বললেন, আজ থাক, তুমি আর একদিন এসো।

আমি বললাম, না, আজই জুলেখার সঙ্গে আমার কথা আছে। আপনি তারে পাঁচ মিনিটের জন্য ডাকেন।

তারও অনেকক্ষণ পর আম্মু জুলেখাকে আনলেন ঘরে। জুলেখা প্যান্ট পরে আছে, ওপরে একটি টি শার্ট। চুল খোলা। সে ঘরে ঢোকামাত্র আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, জুলি চলো আমরা এসব ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই। আজই এক্ষুণি গাড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়বো, চলে যাবো ওয়েস্ট কোস্টে, তারপর জাহাজে করে সমুদ্রে ভাসবো।

জুলেখা প্রথমে আমার কথা মন দিয়ে শুনলো। হঠাৎ এইসব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিলো আমি বুঝি ঝগড়া করতে এসেছি? কিন্তু একটু পরেই তার ভুরু কুঁচকে গেল। সে বললো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো? কেন! আমি তোমার জীবনের আর কোথাও থাকতে চাই না। আমি খারাপ মেয়ে। আমার নামে যত খুশি বদনাম দাও, তারপর আমাকে ডিভোর্স দাও!

জুলি আমি তো তোমার নামে কোনো বদনাম দিই নাই। আমি তো তোমারে কোনোদিন খারাপ মেয়ে বলি নাই।

আমি নিজেই তো বলছি, আমি খারাপ মেয়ে! তোমরা বড়লোক, তুমি অন্য মেয়ে বিয়ে করো। আমার কাছে আর এসো না। ঐসব কী এনেছো? শাড়ি দিয়ে আমাকে ভুলাতে এসেছো? তোমার লজ্জা করে না? তুমি আমার নিজস্ব শাড়ি দাওনি! আমার মা যেগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলোও দেবে না? আমি জানি তোমার বাড়ির লোক ওসব সরিয়েছে!

তারপর সেই শাড়ির কথা নিয়েই জুলেখা তুলকালাম বাঁধিয়ে বসলো, সামান্য জিনিস, কয়েকখানা পুরোনো শাড়ি, তাতে কী আসে যায়! আমি ওকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চাইছি।

জুলেখা আমার আর কোনো কথাই শুনবে না। এক সময় সে গা ঝাড়া দিতে দিতে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

আম্মু বললেন, কামাল, অনেক রাত হয়েছে! তুমি এবার যাও। এরপর কোনো হোটেল খোলা পাবে না। দেখলে তো, ওর সঙ্গে কথা বলে। কোনো লাভ নাই। ডিভোর্স দেওয়াই তোমার পক্ষে ভালো।

আমি বললাম, আপনাদের এই বসবার ঘরে সোফাটার ওপরেই আমি শুয়ে থাকতে পারি। কাল সকালে ওর সঙ্গে আবার কথা বলবো। আম্মু আমরা দুইজনে যদি সব ছেড়ে ছুড়ে দূরে চলে যাই, সেটা ভালো হয় না? আপনি সেই ব্যবস্থা করেন।

আম্মু বললেন, না, না, তোমার এখানে থাকা হবে না। তুমি এখানে রাত কাটালে কেসটা ঘুরে যাবে। ওঠো, ওঠো, বেরিয়ে পড়ো। কাল সকালে আসতে চাও এসো, এখন ওঠো।

আম্মু প্রায় আমাকে জোর করেই বের করে দিলেন ঘর থেকে। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। একটুক্ষণ দাঁড়ালাম সিঁড়ির নিচে। তখনো আমার মনে হচ্ছে, উনি আমাকে ডাকবেন শেষ পর্যন্ত। এক সময় কত সুন্দর সম্পর্ক ছিল, সে সব মনে পড়বে না?

আম্মু শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি গাড়িতে উঠে প্রথমে ভাবলাম কোনো হোটেলেই থাকবো। কোনো হোটেলের নাম মনে এলো না। মাথার মধ্যে কী যে চলছে তা বুঝাতে পারবো না। গাড়ি নিয়ে দিশাহারার মতন এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরছি। এক জায়গায় লাল বাতির জন্য গাড়ি থামিয়েছি, একটা ছিপছিপে চেহারার মেয়ে আমার জানালার কাছে চোখ মটকে বললো, হাই লাভ!

মেয়েটি কী রকম বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই? অধিক রাত্রে এরা পথে পথে মানুষ ধরার জন্য ঘুরে বেড়ায়। গালে রুজ, ঠোঁট দুটি এত লাল যেন মনে হয় রক্ত খেয়ে এসেছে। চোখের নীচে নীল রঙ, মাথার চুল কৃত্রিম ব্লণ্ড। অন্যদিন এসব মেয়ের দিকে আমি ফিরেও চাই না। আজ হঠাৎ কী হলো আমি হাত বাড়িয়ে সামনের দরজা খুলে দিয়ে বললুম, হপ ইন।

মেয়েটির ঘর কাছেই। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সে চাবি দিয়ে দরজা খুললো। আমি তার কাছে কী উদ্দেশ্য নিয়ে গেলাম তা জানো? তখন পৃথিবীর সমস্ত নারী জাতিকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছি। ওর ডাক শুনেই আমার মনে হয়েছিল ওকে খুন করবো। ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, যে সব মেয়ে শুধু শরীর বিক্রি করে, তাদের আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো?

জ্যাক দ্য রিপার?

অনেকটা সেই রকমই বলতে পারো। সেই রকমই আমার মনের ভাব।

মেয়েটা দরজা খুলে বললো, কাম অন ইন, বী কমফরটেবল্।

ঘরের মধ্যে একখানা খাট আর একটা মাত্র চেয়ার। আমি চেয়ারে বসলাম। মেয়েটা তার ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে বললো, আমার নাম লজি। তোমার নাম কী? থাক, নাম বলতে হবে না নিশ্চয়ই কোনো শক্ত নাম হবে! তুমি আমার ব্ল্যাক ডারলিং। আমি ব্ল্যাক পীপলদের খুব পছন্দ করি।

মেয়েটা প্রায় জামা খুলে ফেলেছিল দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, ওসব খুলতে হবে না। যেমন আছো তেমনি থাকো।

মেয়েটা অবাক হয়ে বললো, হেই, তুমি অত টেন্‌স হয়ে আছো কেন? কী হয়েছে তোমার? রিল্যাক্স বেবী। পঞ্চাশটা ডলার দিয়ে দাও আগে!

আমি ভাবছিলাম মেয়েটিকে কখন মারবো। আমার সমস্ত রাগ ঐ রোগা পাতলা মেয়েটার উপর ঢেলে দেবো। কিন্তু মিনিট দশেক বসলাম, আমার হাত উঠলো না। আমি পারবো না। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। মেয়েটাকে টাকা ক'টা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম ঝড়ের বেগে।

গাড়ি নিয়ে আবার ঘুরতে ঘুরতে এক সময় দেখলাম হাইওয়েতে পড়ে গেছি! তখন ঠিক করলাম বস্টনেই ফিরে যাবো। আর তো কোনো হোটেলে থাকার কোনো মানে হয় না।

স্পিডে চালিয়ে দিলাম গাড়ি। কত ঘন্টা একটানা চালিয়েছি তা খেয়াল নেই। যেন একেবারে ফাঁকা, চতুর্দিক ধু ধু করছে, ঘড়িতে দেখলাম পৌনে চারটা বাজে। গাড়িটা থামালাম এক জায়গায়। তারপর অকস্মাৎ আমি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। সে কি অসম্ভব কান্না, নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না কিছুতেই...পুরুষ মানুষের কান্না, তুমি শুনে কী মনে করছো জানি না।

পুরুষ মানুষের কান্নায় দোষের কিছু নেই। কান্না জিনিসটা নারী ও শিশুদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

সেই নির্জন রাস্তায় আমি ঠিক করলাম, জুলেখাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবো। সে যা চায় তাই পাবে। আর কোনোদিন জুলেখার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

তারপর?

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম বটে, কিন্তু ভারমুক্ত হতে পারলাম না তবুও। বুকের মধ্যে যে ভালোবাসার পাথরটা রয়ে গেছে চলতে ফিরতে মনে পড়িয়ে দেয়। জুলেখা আর আমার জীবনে নেই অথচ তার জন্যে ভালোবাসাটা আছে, এ বড় কঠিন সমস্যা, আমার নার্ভাস ব্রেক ডাউনের মতন অবস্থা হলো। কোনো কাজই করতে পারি না। ভয় হলো, আমি বুঝি একদম পাগলই হয়ে যাবো। অনেকে আমাকে দেখেও সেই কথা ভাবতো। তখন ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলাম।

এদেশী ডাক্তার আমার সঙ্গে আগে থেকে চেনা ছিল। আমার সব কথা খুলে বললাম তাকে ডাক্তার সব শুনেটুনে বললো, তোমার যা অবস্থা দেখছি তাতে তুমি তো সত্যিই পাগল হয়ে যেতে পারো। তোমায় অন্য কোনো ওষুধও এখন দেওয়া যাবে না। তোমার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে নারী। তুমি অন্য যে-কোন মেয়ের কাছে যাও। তার সঙ্গে প্রেম করো, সেক্স করো, ঝগড়া করো, যা খুশি। এদেশে কি মেয়ের অভাব! যাও এক্ষুণি যাও।

আমি তাই গেলাম। কার কাছে জানো? সেই লিজ নামের মেয়েটার কাছে। খুঁজে বার করলাম তার ঘর। মেয়েটা তো আমাকে দেখে অবাক। ঠিক চিনতে পেরেছে। সে বললো, ইউ আর দ্যাট ফানি ম্যান! সেদিন ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলে। কী হয়েছিল তোমার?

মেয়েটার বয়স বেশি নয়, জুলেখারই সমান হবে। সেদিন হয়েছিল রাগ, আজ হলো করুণা। মনে হলো, আহা, এরা ভালোবাসা পায় না, পেটের দায়ে শরীর বিক্রি করে। এদেরই তো ভালোবাসা দেওয়া উচিত। এদের মতন দুঃখী, নিপীড়িত আর কে?

আমি সেই শাড়ি দুটো, সেই সব উপহারের জিনিস লিজকে দিলাম। সে কী খুশি! শাড়ি হাতে নিয়ে বললো, এ জিনিস কী করে পরতে হয় আমি তো জানি না। তুমি শিখিয়ে দেবে? আমি বললুম, কাপড়টা তো সিল্ক, তুমি ড্রেস মেটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।

মেয়েটা হাঁটু গেড়ে বসে বললো, তুমি কোথাও খুব আঘাত পেয়েছো, তাই না? তোমার দুঃখের ভাগ দাও আমাকে।

আমি বললুম, না আমি তোমাকে দুঃখ দেবো না, ভালোবাসা দেবো, তোমাদের মতন সব মেয়ের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে আমার সব দিচ্ছি।

আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ঠিক যেন আমার বুকের সেই জমাট বাঁধা ভালোবাসা গলে গলে বেরিয়ে আসছে।

সেইদিন থেকে আমি মুক্ত হয়ে গেলাম।

শেষের অংশটা শুনতে শুনতে আমার ডস্টয়েভস্কির ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্টের একটা দৃশ্য মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেনিয়া নামের বারবণিতাটির কাছে মাথা নিচু করে রানকলনিকফ বলেছিলো, আই ডু নট বাউ ডাউন টু ইউ পার্সোনালি, বাট টু দা সাফারিং হিউম্যানিটি অফ ইওর পার্সন।

কামাল অবশ্য কাউকেই খুন নিজে করে নি। সে মনে মনে হত্যা করতে চেয়েছিলো কয়েকজনকে, এমনকি নিজেকেও। লিজ-এর কাছে এসে বুক খালি করা কান্নায় ওর সেই গ্লানি কেটে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কামাল, তারপর তো অনেকদিন কেটে গেছে। এখনও তোমার জুলেখার কথা মনে পড়ে?

কামাল সব কথাই হাসতে হাসতে বলে। এবারও হেসে উত্তর দিলো, আমার ভালোবাসা এক জায়গায় আটকে ছিল। এখন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। তবে বুকটা ফাঁকা হয়ে আছে তো। সেখান থেকে মাঝে মাঝে একটা হাহাকার বেরিয়ে আসে। সেটা কার জন্য জানি না।

এরপর অনেকক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করে বসে রইলাম।

-০-